কিশোর জ্ঞান-বিজ্ঞান

সেপ্টেম্বর ৮৩

পত্রিকাটি ধুলোখেলায় প্রকাশের জন্য

হার্ড কপি দিয়েছেন - সুজিত কুণ্ডু
স্ক্যান করেছেন - সুজিত কুণ্ডু
এডিট করেছেন - অপ্তিমাস প্রাইম

একটি আবেদন

আপনাদের কারোর কাছে যদি কোন পত্রপত্রিকার কোন বিশেষ সংখ্যা থাকে এবং আপনি সেটা আমাদের স্ক্যান করতে দিতে চান কিংবা নিজে স্ক্যান করে দিতে চান তাহলে নিচের ইমেইল এ যোগাযোগ করুন

dhulokhela@gmail.com

জ্ঞান ও আনন্দের আশ্চর্য সমীকরণ

শারদীয়

কিশোর জ্ঞান-বিজ্ঞান

এবারেও সেরা ১৯৮৩

বিষয় ও লেখক সূচী

অপ্রকাশিত রচনা

লেডি অবলা বসুকে প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের পত্র

বিশেষ রচনা

কোম্পানির বাগ্‌বাগিচা : শ্রীপান্থ ॥ প্রথম মেডিকেল কলেজ : দিবাকর সেন

প্রেমেন্দ্র মিত্রের : ঘনাদা-কাহিনী

উপন্যাস

সঙ্কর্ষণ রায় ॥ সিদ্ধার্থ ঘোষ ॥ সমরজিৎ কর

ফ্যান্টাসী

লীলা মজুমদার ॥ ক্ষিতীন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য ॥ পার্থসারথি চক্রবর্তী

অনুবাদ

এণাক্ষী চট্টোপাধ্যায় ॥ চণ্ডী সেনগুপ্ত ॥ সৌরেন ভট্টাচার্য

ধাঁধা, ভেলকি ও হেঁয়ালি

উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী, সুকুমার রায়, সবিনয় রায়, যোগীন্দ্রনাথ সরকার ও নলিনীকান্ত সরকার

গল্প

সনীল গঙ্গোপাধ্যায় ॥ অরূপরতন ভট্টাচার্য ॥ কিন্নর রায় ॥ বিমল কর ॥ অদ্রীশ বর্ধন ॥ অমিত চক্রবর্তী ॥ নিরঞ্জন সিংহ ॥ সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ ॥ অনীশ দেব ॥ শিশির মজুমদার

সচিত্র রঙীন প্রবন্ধ : সমুদ্রের বিস্ময়

বিমান বসু ॥ সুবীর দত্ত ॥ মৃন্ময়ী দাস ॥ রবীন বন্দ্যোপাধ্যায় সুভাষ সান্যাল ॥ রবীন সেনগুপ্ত ॥ রতন মোহন খাঁ

রঙীন চিত্রকাহিনী

ধীরেন বল ॥ শৈল চক্রবর্তী ॥ দিলীপ দাস ॥ গৌতম কর্মকার ॥ উজ্জ্বল ধর

কার্টুন : প্রণব হোড়

শরীর-স্বাস্থ্য-চিকিৎসাবিজ্ঞান

শিবকালী ভট্টাচার্য ॥ শ্রীকুমার রায় ॥ অরুণ চক্রবর্তী

কিশোর জ্ঞান-বিজ্ঞান

3য় বর্ষ 5ম সংখ্যা ॥ সেপ্টেঃ, 1983

প্রধান সম্পাদক ঃ সমরজিৎ কর

সম্পাদক ঃ রবীন বল

আমাদের দেশের অধিকাংশ লোকের বাস গ্রামে। তাই গ্রামের ব্যাপক উন্নয়ন ও গ্রামবাসীদের যথোপযুক্ত কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা না হলে দেশের সামগ্রিক কল্যাণ কখনও সাধিত হবে না। এই বোধ আমাদের মধ্যে ক্রমশ জাগ্রত হচ্ছে এবং সরকারী ও বেসরকারী বিভিন্ন সংস্থা এ বিষয়ে নানা কর্মোদ্যোগে অগ্রসর হয়েছেন ও হচ্ছেন। এটি খুবই আশার কথা।

এখন আমরা বিশাল শারদীয় সংখ্যার উদ্যোগ আয়োজন নিয়ে ব্যস্ত। এই বিশেষ সংখ্যাটিকে সর্বদিক থেকে আকর্ষণীয় ও সুন্দর করার চেষ্টা চলছে। অন্যান্য বছরের মতো এবারও শারদীয় সংখ্যা তোমাদের মন স্পর্শ করবে বলে আমরা বিশ্বাস করি।

সূচীপত্র

সম্পাদকীয় 1
চিঠিপত্র 2

দপ্তর থেকে
পশ্চিম জার্মানীতে কয়েকদিন ॥ সমরজিৎ কর 4
বিজ্ঞান-সংবাদ 8

পড়াশোনা
সংখ্যা নিয়ে ভাবনা ॥ দেবপ্রসন্ন সিংহ 23
নিষ্ক্রিয় মৌল ঃ হিলিয়াম ॥ অমরনাথ রায় 21
জীবনবিজ্ঞানের প্রথম পাঠ (16) ॥ তারকমোহন দাস 13
পদার্থবিদ্যার প্রশ্নোত্তর ॥ অলক চক্রবর্তী 6

বিজ্ঞানভিত্তিক গল্প
ইনফ্রারেড রহস্য ॥ পার্থসারথি চক্রবর্তী 9

ছবিতে গল্প
বিজ্ঞানসাধক জগদীশচন্দ্র ॥ দিলীপ দাস 17
খুদে বৈজ্ঞানিক ॥ দিলীপ দাস 18, 19
প্রাণী বিচিত্রা ॥ শৈল চক্রবর্তী 40
অ্যাটম বোম ॥ উজ্জ্বল ধর 12
জুলভার্নের টোয়েন্টি থাউজেণ্ড লীগস আণ্ডার দি সী ॥ গৌতম কর্মকার ঃ 54, 55
হাবুলের বিজ্ঞানভাবনা ॥ ধীরেন বল 56
মজার ছবি ॥ প্রণব হোড় 22

পশু পাখি উদ্ভিদ
রকমারি ধনেশ পাখি ॥ অজয় হোম 35
অদ্ভুত প্রাণী অপসাম ॥ পথিক মণ্ডল 36
একটি গাছের আত্মকথা ॥ প্রদীপকুমার ধর 41

উপন্যাস
অল ইণ্ডিয়া কমন পিপ্‌লস্ ব্যাঙ্ক লিমিটেড ॥ ক্ষিতীন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য 25
সবুজ বনের গান ॥ সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ 32

জ্ঞানবিজ্ঞানের নির্বাচিত রচনা
চাঁদ যখন ডুববে না ॥ অপরাজিত বসু 15
ক্যালেণ্ডার ঘড়ি ॥ উত্তমকুমার দাস 24
র‍্যাফেল-রোজা উপাখ্যান ॥ গোপাল ভৌমিক 33
পোর্টল্যাণ্ড সিমেণ্ট ॥ প্রতাপ চট্টোপাধ্যায় 37
রাশিচক্র ও নক্ষত্র ॥ বিমান বসু 38
মাছের বিষ ও বিষাক্ত মাছ ॥ সুধীন সেনগুপ্ত 42
জ্ঞানবিজ্ঞানের বিচিত্র সংবাদ ॥ বরুণ মজুমদার 20

বিজ্ঞান ও বিজ্ঞানী
চারুচন্দ্র ভট্টাচার্য স্মরণে ॥ রতনমোহন খাঁ 30

আবিষ্কারের কাহিনী
হেনিং ব্রাণ্ডটের 'পরশ পাথর' ॥ দিব্যেন্দু পাণিগ্রাহী 16
শরীর-স্বাস্থ্য চিকিৎসা বিজ্ঞানের প্রশ্নোত্তর ॥ হেমেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় 47

নিজে কর
মডেল রোলিং প্রেস ॥ জ্যোতিষ সরকার 53

ছোটদের দপ্তর
বিজ্ঞানজিজ্ঞাসার উত্তরদাতাদের নাম 45
বিজ্ঞান-জিজ্ঞাসা 49
বিজ্ঞানজিজ্ঞাসার উত্তর 49
রবার্ট ও হারা বার্ক ॥ অমিতাভ চট্টোপাধ্যায় 50
বিরল প্রাণী ॥ রত্না তিয়াড়ী 50
মহাকাশ গবেষণা ॥ রামপ্রসাদ দাস 51
শব্দকূট ॥ পারমিতা রায় 49
শব্দকূটের উত্তর 49
জানা-অজানা ॥ হিমাদ্রিশেখর আদিত্যচৌধুরী 51

সহ-সম্পাদক ঃ জয়ন্ত দত্ত, রবীন বন্দ্যোপাধ্যায় ॥ ছবি এঁকেছেন ঃ অলয় ঘোষাল ও বিদ্যাশোক

চিঠিপত্র

ঘনাদা ক্লাব

8. 1লা আগস্ট প্রকাশিত অশোককুমার মিত্রের চিঠি পড়লাম। তিনি ঠিকই বলেছেন। ঘনাদা ক্লাব গড়ে তোলায় আমার আগ্রহ ও সমর্থন পুরোপুরি রয়েছে। তবে সেই সংগে আগ্রহী সদস্যদেরও ঘনাদা সম্পর্কে সড়গড় হওয়া দরকার। তাই ঘনাদার গল্প-সল্প সম্পর্কে যতটুকু জানা আছে তা এই সূত্রে জানাচ্ছি। যতদূর মনে পড়ে, ঘনাদার প্রথম আত্মপ্রকাশ ঘটে ছোটদের এক পূজা-বার্ষিকীতে—1929 কি 1930 সালে। গল্পটির নাম 'মশা'। এ সংবাদ ঘনাদা-স্রষ্টা শ্রীপ্রেমেন্দ্র মিত্রই কোন এক সাক্ষাৎকারে সম্ভবত বলেছেন। সুতরাং ঘনাদার সুবর্ণ-জয়ন্তী হয়ে যাওয়া খুবই স্বাভাবিক। এই দীর্ঘ 50 বছরেরও অধিক কাল ধরে ঘনাদার গল্প প্রকাশিত হয়ে আসছে। এবং আজ পর্যন্ত প্রকাশিত ঘনাদার গল্প গ্রন্থের সংখ্যা পুরো এক ডজন। বইগুলির নাম ঃ (1) ঘনাদার গল্প (2) আবার ঘনাদা (3) অদ্বিতীয় ঘনাদা (4) ঘনাদাকে ভোট দিন (5) ঘনাদা নিত্যনতুন (6) ঘনাদার জুড়ি নেই (7) মঙ্গলগ্রহে ঘনাদা (উপন্যাস) (8) যার নাম ঘনাদা (9) দুনিয়ার ঘনাদা (10) তেল দেবেন ঘনাদা (11) ঘনাদার ফুঁ ও (12) ঘনাদার হিজ্‌বিজ্‌বিজ্‌। বস্তুতঃ এ সব গল্পই ঘনাদার শ্রীমুখনিঃসৃত। স্থান—বনমালী নস্কর লেনের তিনতলার টঙের ঘর বা দোতলার আড্ডাঘর। বিজ্ঞানের ধোঁয়ায় ফাঁপানো এই সব গাল-গল্পের বাইরে ঘনাদা মাঝে মাঝে শুনিয়েছেন তাঁর ঊর্ধ্বতম পূর্বপুরুষদের ঘিরে ইতিহাসভিত্তিক আশ্চর্য কাহিনী। এইসব আশ্চর্য কাহিনী নিয়ে এ পর্যন্ত আরও 4টি বই বেরিয়েছে। (1) দাস হলেন ঘনাদা (2) সূর্য কাঁদলে সোনা (3) আগ্রা যখন টলমল (4) রবিনসন ক্রুশো মেয়ে ছিলেন।

আমি এই ষোলটি বইয়েরই মাত্র হদিশ জানতে পেরেছি। আগ্রহী সদস্যগণ এই 16টি বই পড়লেই ঘনাদা ও ঘনাদার পূর্বপুরুষদের সম্পর্কে বিস্তৃত তথ্য জানতে পারবেন বলে আমি ধারণা করি। ঘনাদা ক্লাব গড়ে তোলায় ঘনাদার পূর্বপুরুষদের ঠিকুজি-কোষ্ঠীর কতটা প্রয়োজন জানি না, তবুও প্রসঙ্গত উল্লেখ করলাম।

জয়ন্ত বন্দ্যোপাধ্যায়, কলকাতা-73

> কেউ কেউ ঘনাদা ক্লাবের প্রতীক এঁকে পাঠিয়েছেন। বস্তুতঃ এগুলি শিল্পীদের দিয়ে আঁকিয়ে মুদ্রণযোগ্য করতে সময় লাগবে। পরবর্তী কোন এক সংখ্যায় সবগুলি প্রতীক একসংগে প্রকাশ করার পরিকল্পনা করা হয়েছে।—সম্পাদক

9. প্রিয় ঘনাদা, আমি জীবিত। আপনার নামাঙ্কিত ক্লাবের সদস্য হতে চাই। **সৌমেনকুমার পাল, হাওড়া-২**

10. আমি ঘনাদা ক্লাবের সভ্য হতে ইচ্ছুক। এই ক্লাবের কার্যপদ্ধতি কি? ক্লাবটি কোথায় স্থাপিত হবে? **কে. এম. বাহারুল ইসলাম, পোঃ বেরেঙ্গা, শিলচর, আসাম।**

11. ঘনাদা ক্লাবের সাধারণ সদস্য হতে চাই। নিয়মাবলী জানালে আনন্দিত হব।—**শ্যামল মুখার্জী, ওঙ্কারনাথ মণ্ডল ও মানু মুখার্জী, বালী, হাওড়া।**

12. আমি একজন ক্ষুদে ঘনাদা ভক্ত। ঘনাদা ক্লাবের সদস্য হতে ইচ্ছুক। —**তাপস বন্দ্যোপাধ্যায়, দুর্গাপুর-১০**

গ. সা. গু ও ল. সা. গু. নির্ণয়

গত জুলাই-83 সংখ্যায় গ. সা. গু. এবং ল. সা. গু. নির্ণয় শীর্ষক নিবন্ধে প্রদত্ত উৎপাদক তালিকায় (পৃ 34) নিচের সংখ্যাগুলোর উৎপাদকে বিশ্লেষণ নিম্নরূপ হবে—

$36 = 2^2 \times 3^2$, $44 = 2^2 \times 11$, $56 = 2^3 \times 7$, $72 = 2^3 \times 3^2$, $92 = 2^2 \times 23$.

গ. সা. গু নির্ণয়ের (পৃ 35) উদাহরণের সারণীতে 3 সংখ্যাটি ঘাতসমূহের প্রথম লাইনে যুক্ত হবে।

ল. সা. গু. সম্পর্কে কিছু জ্ঞাতব্য বিষয়ের (পৃ 35, ডান স্তম্ভ) (খ)-এর উদাহরণে 45 পড়তে হবে। এর সঙ্গে আরও কয়েকটি জ্ঞাতব্য বিষয় যুক্ত হবে।

(গ) দুটি সংখ্যার মধ্যে যদি কোন সাধারণ উৎপাদক না থাকে, তাহলে তাদের তাদের ল. সা. গু. হবে সংখ্যাদুটির গুণফল। যেমন 11 এবং 16-এর ল. সা. গু. $11 \times 16 = 176$.

(ঘ) সংখ্যাগুলির দ্বারা ল. সা. গু. সর্বদা বিভাজ্য। যেমন ল. সা. গু. 6615-কে 27, 35, 45 এবং 49 প্রতিটি সংখ্যা দ্বারা ভাগ করলে ভাগশেষ থাকবে না।

উপরোক্ত ধর্মগুলি অধিক সংখ্যক সংখ্যার ক্ষেত্রেও খাটবে। দুটি সংখ্যার গ. সা. গুর মধ্যে একটি সুন্দর সম্পর্ক আছে, তা হল

দুটি সংখ্যার ল. সা. গু. × গ. সা. গু. = সংখ্যা দুটির গুণফল; এর সত্যতা উদাহরণ সহযোগে যাচাই করে নেওয়া যেতে পারে।

অসীম মুখোপাধ্যায়, কলি-26

গিনসেং

জুলাই সংখ্যা কিশোর জ্ঞান-বিজ্ঞানে সমরজিৎ করের লেখা 'গিনসেং' পড়লাম। মনে হল এই আকর্ষণীয় বিষয় নিয়ে আরও কিছু কথা বলা উচিত।

দীর্ঘ কয়েক শতাব্দী ধরে চীন ও কোরিয় চিকিৎসকরা গিনসেং ব্যবহার করে আসছেন। শুধুমাত্র 1980 সালেই বৃটেনের অত্যুৎসাহীগণ 10 কোটি টাকা খরচ করেছেন এই অত্যাশ্চর্য শিকড় সংগ্রহের জন্য। আমেরিকার 60 লক্ষ লোক 250 টন গিনসেং কিনেছেন যা আমেরিকার প্রতিটি পুরুষ, নারী ও শিশুকে এক মাত্রা করে বিতরণ করার পক্ষে যথেষ্ট। 1971 সালে গিনসেং বিক্রি হয়েছিল 10 কোটি টাকার। 1979 সালে সেই ব্যবসা দাঁড়ায় 60 কোটি টাকায়। যে কোন বেষ্ট সেলারের সঙ্গে পাল্লা দেবার মতো অবস্থা। ওষুধ কোম্পানিগুলো গিনসেং শিকড়কে তরল টনিক, ক্যাপসুল ও ট্যাবলেট আকারে বাজারে ছেড়েছেন। চায়ের সঙ্গে, কোল্ড ড্রিংকস বা চিউইংগাম এমন কি সাবানের সঙ্গে মিশিয়েও গিনসেং বিক্রি হচ্ছে। দেখতে এই গিনসেং (Panax ginseng) মোটেই আকর্ষণীয় নয়। পূর্ণ পরিবর্ধিত গিনসেং গাছ লম্বায় 60 থেকে 90 সেমি. হয়। ফুল ছোট ছোট পার্পল রঙের। উজ্জ্বল লাল রঙের বেরি জাতীয় ফল ঘিরে পাঁচটি লম্বাকৃতি পাতা। এর সবচেয়ে প্রয়োজনীয় অংশ হচ্ছে ধূসর সাদা রঙের মাংসল মূল। পূর্ণাঙ্গ গাছের শিকড় লম্বায় 7 সেমি. পর্যন্ত এবং ওজনে 76 গ্রাম পর্যন্ত হয়ে থাকে। শিকড়টি দু'ভাগে বিভক্ত, ঠিক যেন মানুষের পা। সেইজন্যই এর নাম মানব-মূল চৈনিক ভাষায় গিনসেং। এর মানবাকৃতি শিকড়ের জন্যই প্রথম দিকে শক্তিবর্দ্ধক হিসেবে এর ব্যবহার ব্যাপক ছিল।

চেহারা যাই হোক চীনদেশে অন্ততঃ 5000 বছর ধরে গিনসেং সর্বরোগহর প্রতিষেধক হিসেবেই খ্যাত হয়ে এসেছে। চীনের চিকিৎসাশাস্ত্রে এর বহুল প্রশংসা রয়েছে গ্যাসট্রাইটিস্, ম্যালেরিয়া, ক্যানসার, আর্থ্রাইটিস্, মাথা ধরা, অনিদ্রা, মানসিক অস্থিরতা, স্মৃতিভ্রংশ, সাধারণ সর্দ্দি এবং অগণ্য অনেক আরো অসুখের প্রতিষেধ হিসেবে। চৈনিক সৈন্যরা যুদ্ধক্ষেত্রে গিনসেং ব্যবহার করতো ক্ষত নিরাময়ে এবং দ্রুতশক্তি লাভ করার জন্য। চিন সম্রাটগণ গিনসেং ব্যবহার করতেন দীর্ঘজীবন লাভের জন্য। সপ্তদশ শতাব্দীতে চিনের সঙ্গে ইয়োরোপের বাণিজ্যসূত্র স্থাপিত হবার পর গিনসেং ইয়োরোপের অভিজাত সমাজে বরণীয় হয়। সাম্প্রতিককালের মধ্যে গিনসেং ভক্তদের মধ্যে রয়েছেন প্রখ্যাত মহিলা ঔপন্যাসিক বারবারা কার্টল্যাণ্ড এবং জাপানের বেসবল খেলোয়াড় সাদাহারু-ও।

পাশ্চাত্তোর চিকিৎসাবিজ্ঞানের বিশেষজ্ঞদের কাছে গিনসেং এখনও গুরুত্ব পায়নি।

গিনসেং-এর কার্যকারিতা নিয়ে কিছু দাবী অত্যন্ত বাড়াবাড়ি মনে হলেও চীন ও কোরিয়ার চিকিৎসকগণ, যারা চিরাচরিত প্রথায় চিকিৎসা করেন, তাঁরা মনে করেন যে গিনসেং কেবল আরোগ্য লাভেই সহায়তা করে না --এটি একটি প্রতিষেধও বটে। কিছুদিনের জন্য নিয়মিত গিনসেং সেবন করলে অনেক রোগের হাত থেকে একেবারে অব্যাহতি পাওয়া সম্ভব বলে তাঁরা বিশ্বাস করেন। তাঁদের মতে সাধারণতঃ স্বাস্থ্যের সামগ্রিক উন্নতি এবং দেহে একটি স্বয়ং আরোগ্যক্ষম ব্যবস্থা গড়ে তুলতে এর জুড়ি নেই।

গিনসেং এখনও কারও কাছে রহস্যময়ী প্রহেলিকা, কারও কাছে আশীর্বাদ। এর পক্ষে বিপক্ষে ক্রমেই বহু বিজ্ঞানী জড়ো হচ্ছেন। আরও অনেক বছর গড়িয়ে যাবে হয়তো এর উত্তর পেতে।

মৃণাল দেববর্মণ,
ইনস্টিটিউট অব্ কালচার এণ্ড রিসার্চ, মেদিনীপুর।

খেলনা ওয়ারলেস

জুন '83-র কিশোর জ্ঞান-বিজ্ঞানের চিঠি পত্র বিভাগে দেখলাম তাপসতনু বন্দোপাধ্যায় দেবাশিষ কর্মকারের 'খেলনা ওয়্যারলেস'-এর সার্কিটটি ভুল বলেছেন। কিন্তু আমরা দেবাশিষ কর্মকারের খেলনা ওয়্যারলেসের সার্কিট থেকে সিগন্যাল পেয়েছি। জানি না তিনি কি কারণে সেটিকে ভুল বললেন। আমরা মনে করি তিনি নিশ্চয় কিছু ভুল করেছেন। আমাদের মনে হয় তিনি নিশ্চয় ভেরিয়েবেল কনডেনসারটি লাগাতে ভুল করেছেন। কারণ তিনি বলেন নি কিভাবে ভেরিয়েবল কনডেনসারটি লাগাতে হবে। দেবাশিষ কর্মকার কত নম্বর I .F. T. নিতে হবে বলেন নি। নিতে হবে 1 নম্বর।

অর্ণব পাণ্ডে, রঞ্জন সরকার, জিয়াগঞ্জ, মুর্শিদাবাদ

সবুজ বনের গান

আধুনিক মানচিত্রে কোকোস দ্বীপপুঞ্জের প্রকৃত অক্ষাংশ 15·50 ডিগ্রি এবং দ্রাঘিমাংশ 90·50 ডিগ্রি টমাস কুকের আমলে অক্ষাংশ দ্রাঘিমাংশ নির্ণয়ের ব্যবস্থা এখনকার মতো সূক্ষ্ম এবং উৎকৃষ্টতর ছিল না। মোটামুটি একটা হিসেব করেই নাবিকরা জাহাজ চালাতেন। তবে 'সবুজ বনের গান' নিছক উপন্যাস। অক্ষাংশ দ্রাঘিমাংশ নিয়ে মাথা না ঘামালেই ভাল হয়।

সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ, কলকাতা-17

দপ্তর থেকে

পশ্চিম জার্মানিতে কয়েকদিন

সমরজিৎ কর

আমার প্রিয় ভাইবোনেরা ঃ

এ মাসের 'দপ্তর থেকে' লিখছি পশ্চিম জার্মানির রাজধানী বন-এ বসে। আজ বিকেল ছ'টা পঁয়ত্রিশ মিনিটে হামবুর্গ বিমানবন্দর থেকে রওনা হয়েছিলাম। বন-এর নিজস্ব কোন বিমানবন্দর নেই। এখানে আসতে গেলে নামতে হয় কোলন বিমানবন্দরে। কোলনে পৌঁছেছিলাম সাড়ে সাতটা নাগাদ। সাড়ে সাতটায় আমাদের ওখানে অন্ধকার, কিন্তু কোলনে জুনের শেষে সেখানকার সন্ধ্যে সাড়ে সাতটা মানে দিন। সূর্য তখনো আকাশে। এখানে সূর্য ডোবে রাত সাড়ে ন'টায়। আর তারপরেও চারদিকে আলোকিত অবস্থা—তা রাত সাড়ে দশটা পর্যন্ত। এই গরমের সময়।

সরকারী গাড়ি এবং প্রতিনিধি কোলনের বিমানবন্দরে আমাদের অপেক্ষায় আগে থেকেই উপস্থিত ছিল। প্রতিনিধির নাম ডেটলেফ জুংগফ্লাইশ। বছর তিরিশ বয়েস, আইনের ছাত্র। তার সঙ্গে গাড়িতে এসে পৌঁছলাম বন। আমরা যাকে বলি 'হাইওয়ে', ওরা তাকে বলে 'বন হফ'। সেই বনহফ ধরে ঘণ্টায় প্রায় 120 কিলোমিটার বেগে আমরা ছুটে চললাম। পথের দু'পাশে বন। মাঝে মাঝে চাষের ক্ষেত। সেখানে গম, বার্লি এবং বিটের ফলন। পথে পড়ল রাইন নদী। সেতুর উপর দিয়ে রাইন পেরোলাম। কোলন বিমানবন্দর থেকে বন-এ আমাদের হোটেলে পৌঁছতে সময় লাগল আধ ঘণ্টার মতো। আমাদের হোটেলের নাম 'ব্রিস্টল'। হোটেলের কাছে বন রেলস্টেশন।

এবার জার্মানিতে এসে সবচেয়ে বড় যে ব্যাপারটা আমার খুব বেশি করে চোখে পড়ল সেটা হল পরিচ্ছন্নতা। পথে এক টুকরো ছেঁড়া কাগজও চোখে পড়ে নি। পথে, রেলস্টেশন অথবা বাজারে যেখানে যাও, দেখবে কাছেই বসিয়ে রাখা হয়েছে একটি আধার। ফলের খোসা, মুখ পোছা কাগজ অথবা চকলেটের মোড়ক—এখানকার মানুষ সব কিছু রাস্তায় না ফেলে, ফেলে ওই আধারের ভেতর। এ ব্যাপারে ছোটো ছেলেমেয়ে থেকে শুরু করে বড়রা সবাই খুব সজাগ। এ ছাড়া আরও একটি ব্যাপার দেখলাম। পথে কোন ধুলো নেই। বাতাসে ধুলো ধোঁয়া কিছুই নেই। আশেপাশে কলকারখানা যে নেই তা বলব না। কিন্তু এ দেশের আইন বড় কড়া। সেই সব কলকারখানা থেকে ধুলো অথবা ধোঁয়া, কিংবা বিষাক্ত গ্যাস বেরিয়ে এসে যে বাতাসে মিশবে তার জো নেই। এমন কি মোটরগাড়ি থেকেও এদেশে ধোঁয়া বেরোয় না।

বোম্বাই থেকে লুফৎহানসার প্লেনে রওনা হয়েছিলাম 19 জুন রাত 1 টা 50 মিনিটএ। ফ্রাঙ্কফুর্ট পৌঁছলাম সেখানকার স্থানীয় সময় সকাল সাতটায়। ওদের ঘড়ি আমাদের ঘড়ি থেকে সাড়ে তিন ঘণ্টা পিছিয়ে চলে। আমাদের চেয়ে ওরা অনেকটা পশ্চিমে বলে। প্লেন কোথাও না নেমে সোজা উড়ে এল। সময় লাগলো সাড়ে আট ঘণ্টার মতো।

ফ্রাঙ্কফুর্ট পৃথিবীর অন্যতম বৃহত্তম বিমানবন্দর। শহরের ভেতর দিয়ে গেছে মায়েন নদী। তাই ফ্রাঙ্কফুর্টকে বলা হয় ফ্রাঙ্কফুর্ট অন মায়েন। ফ্রাঙ্কফুর্ট থেকে একদিন ট্রেনে চড়ে গিয়েছিলাম সারবেরভেরাক নামে একটি জায়গায়। এ দিকটায় উঁচু নিচু পাহাড়। পথে পড়ল রাইন এবং মায়েন নদীর সঙ্গম। সারবেরভেরাক বসান হয়েছে পরীক্ষামূলক একটি শক্তি উৎপাদক কারখানা। জার্মানি শক্তি উৎপাদন করে কয়লা, খনিজ তেল, গ্যাস থেকে। আর করে পারমাণবিক জ্বালানি থেকে। পশ্চিম জার্মানিতে উঁচু মানের কয়লা পাওয়া যায় না! এখানে যে কয়লা পাওয়া যায় তাকে ওরা বলে ব্রাউন কোল। তাতে কার্বনের ভাগ থাকে কম। সেই কয়লা থেকে এখানে তৈরী হচ্ছে পেট্রোল অথবা কেরোসিনের মতো তরল জ্বালানি। তাই পুড়িয়ে বিদ্যুৎশক্তি।

ফ্রাঙ্কফুর্ট থেকে ট্রেনে চড়ে গিয়েছিলাম স্টুটগার্ট। সময় লাগল দুই ঘণ্টার মত। শহর হিসেবে স্টুটগার্ট এমন বড় কিছু নয়। কিন্তু ঐতিহ্যপূর্ণ শহর। আসার সময় পথে পড়ল 'উলম' স্টেশন। এই উলমে-ই জন্মেছিলেন আইনস্টাইন। স্টুটগার্ট বিশ্ববিদ্যালয়ে গিয়েছিলাম একদিন। কি বিরাট এলাকা। মনে হয় যেন একটি শহর। এখানে সৌরশক্তি নিয়ে গবেষণা হচ্ছে। সিলিকন সৌরকোষের সাহায্যে যাতে কম খরচে বিদ্যুৎশক্তি উৎপাদন করা যায় সৌরশক্তি থেকে তার জন্যে কত রকম পরীক্ষানিরীক্ষাই না করছেন এখানকার বিজ্ঞানীরা।

স্টুটগার্ট থেকে গিয়েছিলাম একদিন বাদেন বাদেন।

অসামান্য মনোরম এখানকার দৃশ্য। চারদিকে ঢেউ-খেলানো পাহাড়। বন, শুধু বন। বার্চ, ফার, এলম প্রভৃতি গাছ। এটি সেই বিখ্যাত ব্ল্যাকফরেস্ট এলাকা। সেই ব্ল্যাক-ফরেস্টের মধ্যে দিয়ে আমরা গাড়ি চালিয়ে ঘুরলাম অনেকক্ষণ। শুনলাম ব্ল্যাক ফরেস্ট নিয়ে এখন সমস্যা দেখা দিয়েছে। পরিবেশ দূষণের ফলে অতিকায় এই জঙ্গলের বহু গাছপালা এখন নানান রোগে আক্রান্ত, অনেক জায়গায় গাছপালা মরছে—তাও দেখলাম। এই বনভূমিকে রোগের হাত থেকে রক্ষা করার চেষ্টা করছেন জার্মান বিজ্ঞানীরা।

বাদেন বাদেন-এ আছে কয়েকটি উষ্ণ প্রস্রবণ। তাদের জলে স্নান করতে আসেন বহু লোক। সেই জলে স্নান করলে অনেক রোগের উপশম হয়। এখান থেকে মিনিট কুড়ির পথ কারহাইস'। এটি একটি ছোট্ট শহর। এখানেই জন্মেছিলেন বিশিষ্ট জ্যোতির্বিজ্ঞানী কেপলার। যে বাড়িতে তিনি জন্মেছিলেন সেই বাড়িটিও দেখলাম। তিনতলা ছোট্ট বাড়ি। পাশে বিরাট একটি চত্বর। সেই চত্বরে দাঁড়িয়ে রয়েছে কেপলারের মূর্তি।

স্টুটগার্ট থেকে গিয়েছিলাম মিউনিখ। ট্রেনে। খুব ভাল লাগল। এখানে এসে যে হোটেলটিতে উঠেছিলাম তার নাম 'ইডেন ভলফ,' আগের বার—তা বছর ছয় আগে যখন মিউনিখ আসি—তখনও উঠেছিলাম এই হোটেলেই।

মিউনিখে ছিলাম দু দিন। সেই ফাঁকে দেখতে গিয়েছিলাম এখানকার বিখ্যাত প্রতিষ্ঠান 'মেৎসেরস্কিমিট বলকাও ব্লোহম'। এখানকার কুশলীরাই তৈরি করেছেন 'এয়ার বাস'। এঁরা তৈরি করেন যুদ্ধের নানারকম সাজ-সরঞ্জাম, ফাইটার প্লেন, হেলিকপ্টার, ক্ষেপণাস্ত্র, ট্যাঙ্ক, মহাকাশযানের নানারকম যন্ত্রপাতি। দেখলাম একটি কৃত্রিম উপগ্রহও তৈরি করছেন এঁরা। এই উপগ্রহ আগামী বছর উৎক্ষেপ করা হবে, বিরাট এলাকা কুড়ে এঁদের কারখানা।

এই কারখানা থেকে মাইল কুড়ি দূরে বিরাট এলাকা জুড়ে খামার। গম, বার্লি এবং লেটুসের চাষ চলছে সেখানে। ক্ষেতের মধ্যে বসেছে বড়সড় একটি প্ল্যান্ট। সেই প্ল্যান্টে চাষের আবর্জনা—গাছপালা থেকে যাবতীয় জৈবিক বস্তু থেকে তৈরি হচ্ছে জ্বালানি গ্যাস। সেই গ্যাসে চলছে প্রায় 80 কিলোওয়াটের মত শক্তি উৎপাদনকারী একটি জেনারেটার। ব্যাপারটা দেখে খুবই ভাল লেগেছে আমার। আমাদের দেশেও তো রয়েছে যথেষ্ট চাষের ক্ষেত। সেই সব ক্ষেতে কত কৃষিজাত জঞ্জালই না জমে। আমরাও তো সেই জঞ্জালের সাহায্যে এইভাবে বিদ্যুৎ শক্তি উৎপাদন করতে পারি। ওই জৈবিক গ্যাস উৎপাদনকারী কারখানার মালিক একজন তরুণ ইঞ্জিনিয়ার। তিনি বললেন, বিদ্যুৎ তো তৈরি করছিই। এছাড়াও তৈরি হচ্ছে প্রচুর জৈবিক সার। সেই সার জমিতে ছড়াচ্ছি।

মিউনিখ থেকে বার্লিন। বার্লিনে দেখলাম বিরাট তাপ বিদ্যুৎকেন্দ্র। এখানে উৎপাদিত হচ্ছে 2000 মেগাওয়াট। এই বিদ্যুৎ বার্লিন শহরের চাহিদা মেটায়। এছাড়া এই বিদ্যুৎকেন্দ্র থেকে যে গরম জল বেরিয়ে আসে সেই জল ওরা বাড়ি বাড়ি সরবরাহ করে। অর্থাৎ শক্তির যাতে অপচয় না হয় সেদিকে তাদের দারুন নজর।

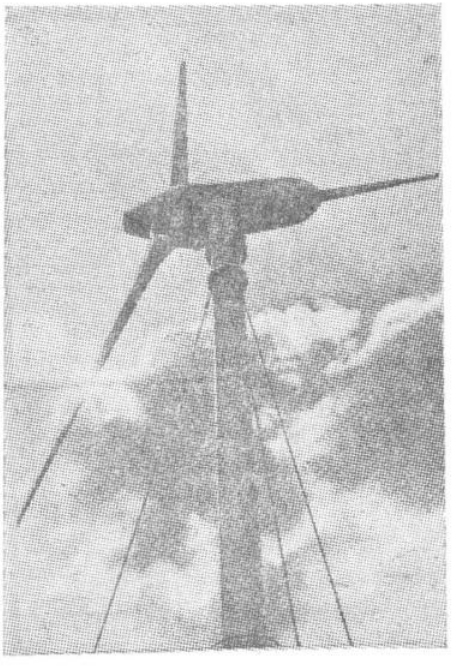

ইউরোপের বৃহত্তম বায়ুবিদ্যুৎকেন্দ্র

হামবুর্গের বিখ্যাত টেলিফুঙ্কেন প্রতিষ্ঠানও দেখলাম। এঁদের পরিকল্পনায় উত্তর সাগর এলাকায় বসান হয়েছে ইউরোপের বৃহত্তম বায়ু বিদ্যুৎকেন্দ্র। একশ মিটার থামের উপর বসান হয়েছে পঞ্চাশ মিটার দৈর্ঘ্যের পাখা। বাতাসে ঘোরে পাখা, তার শক্তিতে উৎপাদিত হচ্ছে তিন মেগাওয়াটের মতো বিদ্যুৎশক্তি।

বনেও কয়েকটি শিল্প প্রতিষ্ঠান দেখলাম। দেখলাম গভীর খাত খুঁড়ে কয়লা তোলার কাজ। খনি দেখতে অতিকায় গহ্বরের মতো। যার গভীরতা 300 মিটার। বনে জন্মেছিলেন বিশিষ্ট যন্ত্রশিল্পী বিটোভেন। শহরের উপর তাঁর বাড়ি, দেখে এলাম। দেখতে গিয়ে মনে হলো সেখানেও বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে যেভাবে বিটোভেনের নিজস্ব যন্ত্রপাতি রক্ষিত হচ্ছে—এদেশে আমরা তা কল্পনা করতে পারি না।

পদার্থবিদ্যা ঃ প্রশ্নোত্তর

অলক চক্রবর্তী

মাধ্যমিক স্তরে ভৌতবিজ্ঞানের পদার্থবিদ্যা অংশে নানা রকম ছোট্ট ছোট্ট প্রশ্ন ছাত্রছাত্রীদের করা হয়। যুক্তি দিয়ে সেগুলির উত্তর দিতে অনেক সময় নানারকমের ভুল হয়ে যায়। হয়তো অযথা অপ্রাসঙ্গিক কিছু লেখা হয়, নয়তো দরকারী কথাটাই বাদ পড়ে যায়।

আমরা এই বিভাগে ছোট ছোট প্রশ্নের সঠিক উত্তর কিরকম হবে, সে বিষয়ে আলোচনা করব।

প্রথমেই শুরু করি তাপ অধ্যায়ের একটা অংশ নিয়ে—অবস্থার পরিবর্তন।

প্রশ্ন ঃ ভীষণ গরমের সময় লোকজন-ঠাসা প্রেক্ষাগৃহ থেকে বাইরে এলে আমরা কেন হঠাৎ ঠাণ্ডা বোধ করি?

উত্তর ঃ লোকজন-ঠাসা বদ্ধ প্রেক্ষাগৃহের মধ্যে শরীরের ঘাম বিশেষ বাষ্পীভূত হতে পারে না। বদ্ধ হলের মধ্যে জলীয় বাষ্পও সাধারণতঃ বেশি থাকে। কিন্তু কোন লোক যখন বাইরে খোলা জায়গায় আসে, তখন শরীরের ঘাম তাড়াতাড়ি বাষ্পীভূত হতে শুরু করে এবং দরকারী লীন তাপ শরীর থেকেই আসে। এজন্যে প্রেক্ষাগৃহের থেকে বাইরে এলে আমরা হঠাৎ ঠাণ্ডা অনুভব করি।

প্রশ্ন ঃ হাতের তালুতে এক টুকরো বরফ রাখলে, হাতটা ক্রমশঃই বেশি ঠাণ্ডা বলে মনে হয় কেন?

উত্তর ঃ হাতের তালুতে বরফ রাখলে বরফ আস্তে আস্তে জল হয়ে যায়। গলার জন্যে দরকারী তাপ প্রধানতঃ হাতের তালু থেকেই আসে। যতই বরফ গলে, ততই হাত ঠাণ্ডা বলে মনে হয়।

প্রশ্ন ঃ মাথায় জলপটি দিয়ে পাখার সাহায্যে হাওয়া দিলে বা ওডিকোলন লাগালে জ্বরগ্রস্ত রোগীর দেহের উষ্ণতা কমে যায় কেন?

উত্তর ঃ হাওয়া দিলে বা বাতাস পড়লে বাষ্পায়ন তাড়াতাড়ি হয়, অর্থাৎ জল বা ওডিকোলন উবে যায়। অবস্থা পরিবর্তনের জন্যে দরকারী তাপ কপাল থেকে পাওয়া যায়। এর ফলে দেহের উষ্ণতা আস্তে আস্তে কমে যায়।

প্রশ্ন ঃ থার্মোমিটারের কুণ্ডে ভিজে কাপড়ের টুকরো জড়ালে ওর পারদসূত্র নেমে আসে কেন?

উত্তর ঃ থার্মোমিটার কুণ্ডে ভিজে কাপড়ের টুকরো জড়ালে কাপড়ের জল বাষ্প হয়ে চলে যায় এবং বাষ্পীভবনের জন্যে দরকারী লীন তাপ পাওয়া যায় কুণ্ডের পারদ থেকে। ফলে কুণ্ডে পারদের আয়তন কমে এবং পারদসূত্র নেমে আসে।

প্রশ্ন ঃ ভিজে কাপড় গায়ে শুকোনো উচিত নয় কেন?

উত্তর ঃ ভিজে কাপড় থেকে জল বাষ্পীভূত হয়। ঐ কাপড় গায়ে থাকলে বাষ্পীভবনের লীনতাপ দেহ থেকেই বেরিয়ে যায়, আর ভিজে কাপড় গায়েই শুকোয়। দেহ ঐভাবে হঠাৎ ঠাণ্ডা হয় বলে ঠাণ্ডা লেগে সর্দি, কাশি, জ্বর হতে পারে। তাই ভিজে কাপড় গায়ে শুকোনো অনুচিত।

প্রশ্ন ঃ গরমকালে কুকুর জিভ বের করে হাঁপায় কেন?

উত্তর ঃ কুকুরের জিভ থেকে জল গরমকালে বাষ্পীভূত হবার সময়ে বাষ্পীভবনের লীনতাপ কুকুরের জিভ থেকেই পাওয়া যায়। ফলে জিভ ঠাণ্ডা হয় ও কুকুরের আরাম বোধ হয়। এই কারণে গরমকালে কুকুর জিভ বের করে হাঁপায়।

প্রশ্ন ঃ গরম চা বা দুধ তাড়াতাড়ি ঠাণ্ডা করার জন্যে কাপ থেকে প্লেটে ঢালা হয় কেন?

উত্তর ঃ গরম চা বা দুধ কাপ থেকে প্লেটে ঢাললে ছড়িয়ে পড়ে; তরলের উপরের ক্ষেত্রফল বেশি হওয়ায় বাষ্পীভবন তাড়াতাড়ি হয় এবং সেজন্যে দরকারী লীন তাপ পাওয়া যায় ঐ তরল থেকে। তাই চা বা দুধ তাড়াতাড়ি ঠাণ্ডা হয়ে যায়।

প্রশ্ন ঃ গরমকালে বাড়ির বারান্দায়, ছাদে, রাস্তায় জল ছিটানো হয় কেন?

উত্তর ঃ গরমকালে বাড়ির বারান্দায়, ছাদে, রাস্তায় জল ছিটোলে ঐ জল বাষ্পীভবনের লীন তাপ সংগ্রহ করে সংলগ্ন স্থান থেকে (বারান্দা, ছাদ, রাস্তা এবং ওদের ওপরে থাকা বাতাস থেকে)। তাই বারান্দার, ছাদের, রাস্তার বাতাস ঠাণ্ডা হয়। ঐভাবে ঠাণ্ডা রাখার জন্যেই গরমকালে জল ছিটানো হয়।

প্রশ্ন ঃ পাখা চললে গায়ের ঘাম তাড়াতাড়ি শুকোয় কেন?

উত্তর ঃ পাখা চললে ঘামে ভেজা দেহ প্রতি মুহূর্তে নতুন নতুন বাতাসের (যাতে জলীয় বাষ্পের পরিমাণ আপেক্ষাকৃত কম থাকে) কাছাকাছি আসে বলে ঘাম তাড়াতাড়ি শুকোয় (আর দেহ তাড়াতাড়ি ঠাণ্ডা হয়)। বায়ু চলাচল করলে বাষ্পায়নের হার তাড়াতাড়ি হয় বলেই ঐরূপে ঘটে।

প্রশ্ন ঃ গরমকালে দরজা জানালায় ভিজে খস্‌খস্ ঝোলানো হয় কেন?

উত্তর ঃ গরমকালে ভিজে খস্‌খস্ দরজা জানালায় ঝোলালে খস্‌খসের জল বাষ্পীভূত হয় এবং বাষ্পায়নের লীন তাপ পাওয়া যায় ঘরের বাতাস থেকে। ফলে ঘরের বাতাস ঠাণ্ডা হয় এবং গরমের কষ্ট কমে।

প্রশ্ন : একটি থার্মোফ্লাস্কে করে পৃথিবী থেকে 60°C উষ্ণতায় কিছুটা জল নিয়ে চাঁদে গিয়ে একটি খোলা বিকারে ঐ জল ঢেলে দিলে কি দেখা যাবে? কেন?

উত্তর : চাঁদে ঐ জল সঙ্গে সঙ্গে ফুটতে আরম্ভ করবে এবং বাষ্প কণাগুলো জলের তল থেকে উঠে পুনরায় জলে আসবে।

প্রকৃতপক্ষে, চাঁদে বাতাস নেই বলে সেখানে বায়ুর চাপ শূন্য। চাপ কমালে জলের স্ফুটনাঙ্ক কমে যায় বলে শূন্য চাপে স্বাভাবিক স্ফুটনাঙ্কের চেয়ে অনেক কম উষ্ণতায় জল ফুটবে। কিন্তু বাতাস থাকে না বলে জলীয় বাষ্পের কণাগুলো ওপরে উঠে ভাসতে না পেরে আবার নিচে নেমে আসবে।

প্রশ্ন : ফুটন্ত অবস্থায় আলাদাভাবে ভালো জল থেকে ও নুনমেশানো জল থেকে যে বাষ্প ওঠে, তাদের উষ্ণতা কি সমান হবে? কেন? দুটো ক্ষেত্রে জলের উষ্ণতা কি সমান হবে? কেন?

উত্তর : দুটোর বেলাতেই বাষ্পের উষ্ণতা সমান হবে, কিন্তু জলের উষ্ণতা আলাদা হবে। নুনমেশানো জলের স্ফুটনাঙ্ক ভাল জলের স্ফুটনাঙ্কের চেয়ে বেশি হয় অর্থাৎ তা আরো বেশি উষ্ণতাতে ফোটে। অতএব, দ্বিতীয় বারে জলের উষ্ণতা বেশি হবে। কিন্তু যে বাষ্প ওঠে, তাতে অন্য কোন জিনিস (নুন) থাকে না বলে, বাষ্পের উষ্ণতা দুটোর বেলাতেই এক থাকে (ভাল জলের স্ফুটনাঙ্কের সমান হয় অর্থাৎ 100°C হয় সাধারণ বায়ুচাপে)।

প্রশ্ন : তাপ দিয়ে জল ফুটতে থাকলে জলের উষ্ণতা বাড়ে না তবে তখন ঐ তাপ কোথায় যায়?

উত্তর : জলে তাপ দিলে জলীয় বাষ্পে পরিণত হওয়ার সময়ে বাষ্পীভবনের লীনতাপ দরকার। প্রযুক্ত তাপ ঐ অবস্থান্তর ঘটাতে ব্যয় হয়, তাই জলের উষ্ণতা আর বাড়ে না।

প্রশ্ন : স্টীমকে দেখা যায় না, কিন্তু কেটলীর মুখ দিয়ে ফুটন্ত জল থেকে যে স্টীম বেরোয়, তার রং সাদা দেখায় কেন?

উত্তর : স্বাভাবিক বায়ুচাপে স্টীমের উষ্ণতা 100°C। কেটলিতে জল ফুটতে থাকলে যে স্টীম বের হয়, তা নলের মুখ দিয়ে বের হয়। কিন্তু বাইরের বাতাসের উষ্ণতা 100°C-র চেয়ে অনেক কম থাকে। ফলে কেটলী থেকে যে স্টীম বের হয়, তার উষ্ণতা বাইরের বাতাসের কাছাকাছি এলে সঙ্গে সঙ্গে 100°C-র নিচে নেমে আসে এবং কিছুটা স্টীম ছোট ছোট জলের কণায় পরিণত হয় এবং বাতাসে ভাসতে থাকে। ঐজন্যেই ঐ ভেসে থাকা জলের কণা আমরা দেখি বলে স্টীমের রং সাদা মনে হয়।

প্রশ্ন : ভিজে কাপড় স্থির বায়ুর চেয়ে চলাচলকারী বায়ুতে তাড়াতাড়ি শুকোয় কেন?

উত্তর : বায়ু চলাচল করলে বাষ্পায়নের হার তাড়াতাড়ি হয়। ভিজে কাপড় থেকে জল বাষ্পীভূত হয়ে ওর কাছাকাছি বায়ুতে মিশে যায়। নির্দিষ্ট উষ্ণতার বাতাসের জলীয় বাষ্প নেওয়ার ক্ষমতা নির্দিষ্ট। বাতাসে জলীয় বাষ্প যত মিশতে থাকে ততই ঐ বাতাসের জলীয় বাষ্প ধরার ক্ষমতা কমতে থাকে। ফলে মোটামুটি স্থির বাতাসে জলে ভেজা কাপড় আস্তে আস্তে শুকোয়, যেখানে চলাচলকারী বায়ুতে ভিজে কাপড় প্রত্যেক বারে নতুন নতুন বায়ুর কাছাকাছি আসে, যাতে জলীয় বাষ্পের পরিমাণ অনেক কম থাকে। ফলে ভিজে কাপড় তাড়াতাড়ি শুকোয়।

প্রশ্ন : 100°C উষ্ণতার জলের চেয়ে 100°C উষ্ণতার স্টীমে বেশি ক্ষত হয় কেন?

উত্তর : জলের বাষ্পীভবনের লীনতাপ প্রতি গ্রামে 537 ক্যালরি। অতএব, 100°C উষ্ণতায় প্রতি গ্রাম বাষ্পে 100°C উষ্ণতার প্রতি গ্রাম জলের চেয়ে 537 ক্যালরি তাপ বেশি থাকে। তাই 100°C উষ্ণতার জলের চেয়ে 100°C উষ্ণতার স্টীমে বেশি ক্ষত হয়।

প্রশ্ন : একটা পাত্রে রাখা ভাল জলের মধ্যে দিয়ে স্টীম চালালে জলের স্ফুটন হবে কি? কেন?

উত্তর : না, ঐ অবস্থায় জলের স্ফুটন হবে না। কারণ জলের ভেতর দিয়ে স্টীম চালালে ঐ স্টীম ঘন হয়ে তাপ ছাড়বে এবং পাত্রের জল ঐ তাপ নেবে। ফলে পাত্রের জলের উষ্ণতা বাড়বে। এক সময় বিকারের জলের উষ্ণতা, স্টীমের উষ্ণতার সমান হবে এবং তখন ওদের মধ্যে তাপের দেওয়া-নেওয়া বন্ধ থাকবে। আবার জলের স্ফুটন ঘটাতে গেলে বাষ্পীভবনের জন্যে লীনতাপের দরকার। কিন্তু ঐ অবস্থায় জল ও স্টীমের উষ্ণতা সমান হয়ে যাওয়ায় ঐ লীনতাপ পাওয়া যাবে না। জলও ফুটবে না।

প্রশ্ন : রান্নার সময়ে পাত্রের মুখ ঢাকনা দিয়ে ভালোভাবে বন্ধ করলে রান্নার পাত্রের তরিতরকারী প্রভৃতি তাড়াতাড়ি সেদ্ধ হয় কেন?

উত্তর : রান্নার পাত্রের মুখ ঢাকনা দিয়ে ভালোভাবে বন্ধ থাকলে এর ভেতরের বাষ্প বের হতে না পারায় ভেতরের জলের ওপর চাপ দেয়, এর ফলে জলের স্ফুটনাঙ্ক বাড়ে। এই উষ্ণতা বাড়ার ফলে জল বেশি করে তাপ নেয় বলে তরিতরকারী প্রভৃতি তাড়াতাড়ি সেদ্ধ হয়। এজন্যে রান্নার কাজও তাড়াতাড়ি হয়।

জয়পুরিয়া কলেজ, কলকাতা-5

বিজ্ঞান-সংবাদ

আচার্য প্রফুল্লচন্দ্রের 122তম জন্মবার্ষিকী

2 আগস্ট দক্ষিণ কলকাতার সুজাতা সদনে ন্যাশানালিস্ট কেমিস্ট অ্যাসোসিয়েশন ও কিশোর কল্যাণ পরিষদের যৌথ উদ্যোগে আচার্য প্রফুল্লচন্দ্রের 122তম জন্মবার্ষিকী উদ্‌যাপিত হয়। এই উপলক্ষে 'সুসংহত গ্রামোন্নয়ন ও গ্রামীণ কর্মসংস্থান' সম্পর্কে একটি গুরুত্বপূর্ণ আলোচনাচক্রের আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন ডঃ সুকুমার দত্ত এবং উদ্বোধন করেন যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ডঃ মণীন্দ্রমোহন চক্রবর্তী। এদেশে রসায়নচর্চায় এবং দেশবাসীকে স্বয়ম্ভর করে তোলার মহৎ প্রয়াসে আচার্য প্রফুল্লচন্দ্রের বিরাট অবদান এবং কিভাবে সুসংহত উপায়ে গ্রামোন্নয়ন ও গ্রামীণ কর্ম-সংস্থানের ব্যবস্থা করা যেতে পারে সে সম্পর্কে আলোচনা করেন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন সহ-উপাচার্য ডঃ পূর্ণেন্দুকুমার বসু, বসু বিজ্ঞান মন্দিরের অধিকর্তা ডঃ শশাঙ্কচন্দ্র ভট্টাচার্য, ডঃ ক্ষেত্রপ্রসাদ সেনশর্মা, সতীশচন্দ্র পর্বত, ডঃ সুনীল তলাপাত্র, ডাঃ বঙ্কিমচন্দ্র শেঠ, রবীন বন্দ্যোপাধ্যায়, তুলসী মুখোপাধ্যায় ও প্রদীপ চট্টোপাধ্যায়। সভায় সঙ্গীত পরিবেশন করেন সুতপা চক্রবর্তী ও দীপক ভট্টাচার্য।

বিজ্ঞান প্রদর্শনী ও আলোচনাচক্র

গত 9-12 জুন পাঁশকুড়ার ব্রাডলি বার্ট হাই স্কুলে স্থানীয় ফোটন সায়েন্স সেন্টার আন্তঃজেলাভিত্তিক প্রতিযোগিতামূলক বিজ্ঞান-মডেল প্রদর্শনী ও আলোচনাচক্রের আয়োজন করে। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ডঃ ক্ষেত্রপ্রসাদ সেনশর্মা এবং প্রধান অতিথিরূপে উপস্থিত ছিলেন 'কিশোর জ্ঞান-বিজ্ঞান'-এর সহ-সম্পাদক রবীন বন্দ্যোপাধ্যায়। মেদিনীপুর জেলার প্রায় 20টি স্কুল ও সায়েন্স ক্লাবের ছেলে-মেয়েরা মডেল প্রদর্শনী ও আলোচনাচক্রে অংশগ্রহণ করে। এই উপলক্ষে নানা সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান এবং একটি স্মারক পত্রিকাও প্রকাশ করা হয়।

ঝাড়গ্রামে বিজ্ঞান আলোচনাচক্র

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের যুব কল্যাণ বিভাগ এবং বিড়লা শিল্প ও কারিগরী সংগ্রহশালার যৌথ উদ্যোগে গত 31 জুলাই ঝাড়গ্রামে মহকুমা তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরে একটি প্রতিযোগিতামূলক বিজ্ঞান আলোচনাচক্রের আয়োজন করা হয়। আলোচনার বিষয় ছিল 'আজ ও আগামীকালের যোগাযোগ ব্যবস্থা'। বিদ্যালয় পর্যায়ের এই আলোচনায় প্রথম স্থান অধিকার করে দেবলীনা দাশগুপ্ত (আর বি এম বিদ্যালয়) এবং দ্বিতীয় হয়েছে ঐ স্কুলেরই ছাত্রী ঝুমা নাথ। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন ঝাড়গ্রাম ব্লক অধিকর্তা মানিক জানা এবং ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন যুব ব্লক আধিকারিক মধুসূদন সরকার।

কলকাতায় ভারতের ভাবী মহাকাশচারী

মহাকাশ অভিযানের জন্যে নির্বাচিত দুই ভারতীয় মহাকাশচারী উইং কমাণ্ডার রবীশ মালহোত্রা ও স্কোয়ার্ডন লিডার রাকেশ শর্মা গত 3 আগস্ট কলকাতায় এসেছিলেন। রুশ মহাকাশচারীদের সঙ্গে তাঁদের মধ্যে একজন আগামী বছরের এপ্রিল-জুন মাসে মহাকাশ অভিযানে অংশগ্রহণ করবেন। গত বছর সেপ্টেম্বর থেকে তাঁরা রাশিয়ায় প্রশিক্ষণ গ্রহণ করছেন। প্রথম পর্যায়ের তালিম শেষ হয়েছে। দ্বিতীয় পর্যায়ের তালিম নিতে আগামী সেপ্টেম্বরে তাঁরা আবার রাশিয়ায় যাবেন।

হিরোসিমা দিবস

গত 7 আগস্ট দি সায়েন্স অ্যাসোসিয়েশন অফ বেঙ্গল-এর উদ্যোগে বড়িষা হাই স্কুলে হিরোসিমা দিবস উপলক্ষে একটি আলোচনা-সভার আয়োজন করা হয়। সভায় ডঃ ক্ষেত্রপ্রসাদ সেনশর্মা 'পারমাণবিক অস্ত্রের বিপদ ও মানুষের ভবিষ্যৎ' সম্পর্কে তথ্যপূর্ণ মনোজ্ঞ আলোচনা করেন। হিরোসিমা ও নাগাসাকির ওপর পরমাণু-বোমার প্রলয়কর বিস্ফোরণে মহাবিজ্ঞানী আইনস্টাইনের মনোবেদনা ও আত্মগ্লানির কথা ব্যক্ত করেন রবীন বন্দ্যোপাধ্যায়। প্রারম্ভে সংস্থার সম্পাদক শুভব্রত রায়চৌধুরী হিরোসিমা দিবস উদ্‌যাপনের তাৎপর্য বিবৃত করেন।

অরুণোদয় বিজ্ঞান দপ্তর

আচার্য প্রফুল্লচন্দ্রের 122তম জন্মদিবস উপলক্ষে শ্রীরামপুরের বল্লভপুর হাইস্কুলে 13 আগস্ট বিজ্ঞান বিষয়ক বক্তৃতা প্রতিযোগিতার আয়োজন করে বিজ্ঞান দপ্তর। তিনটি বিভাগে পঞ্চম শ্রেণী থেকে দ্বাদশ শ্রেণী পর্যন্ত ছাত্র-ছাত্রীরা এই প্রতিযোগিতায় যোগদান করে।

বিজ্ঞান এষণা, শিলিগুড়ি

শিলিগুড়ির শক্তিগড় বিদ্যাপীঠের অন্তর্গত 'বিজ্ঞান এষণা' সংস্থা গত এপ্রিল মাসে একটি প্রতিযোগিতামূলক বিজ্ঞান-আলোচনা অনুষ্ঠান করে। শিলিগুড়ি মহকুমা ও রাজগঞ্জ ব্লকের বিভিন্ন শিক্ষায়তন ও বিজ্ঞান ক্লাবের ছাত্র-ছাত্রী ও সভ্য-সভ্যারা আলোচনায় অংশগ্রহণ করে।

কল্যাণীতে বিজ্ঞান প্রদর্শনী

কিছুদিন আগে কল্যানীতে স্কুলের ছাত্রছাত্রীদের তৈরী মডেল, চার্ট ও প্রজেক্ট নিয়ে একটি বিজ্ঞান প্রদর্শনী আয়োজিত হয়। মডেলগুলির মধ্যে স্থানীয় বিধানচন্দ্র বালিকা বিদ্যালয়ের নবম শ্রেণীর ছাত্রী মৌসুমী বসু ও তপতী ঘোষের 'ফায়ার এলার্ম' এবং দশম শ্রেণীর ছাত্রী মীনাক্ষী বসু ও স্মৃতি মণ্ডলের 'ওয়ার্কিং টকি' বিশেষভাবে প্রশংসিত হয়।

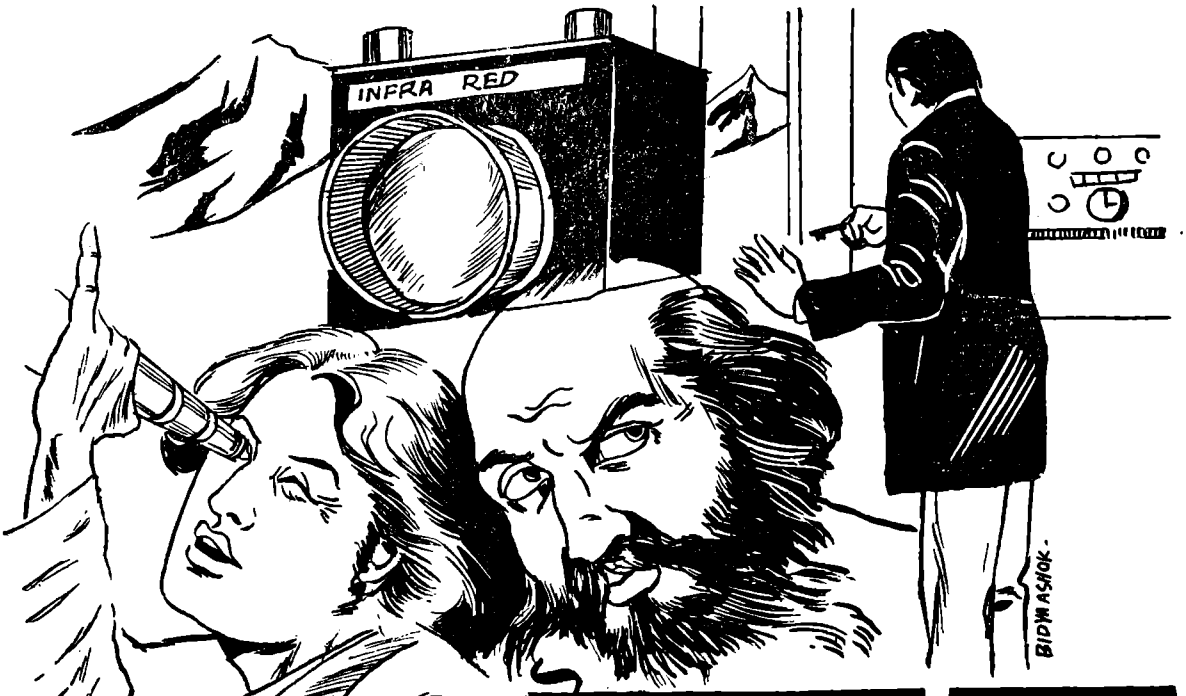

ইনফ্রারেড রহস্য

পার্থসারথি চক্রবর্তী

কালিম্পং শহরে একেবারে উঁচু পাহাড়ের উপর হলুদ রংয়ের বাড়িটা দেখলে চোখ জুড়িয়ে যায়। এই জায়গার নাম ডেলো। কাছেই একটা সরকারী রেস্ট হাউস তৈরী হয়েছে। কিন্তু এখনও সেটা 'চালু' হয় নি।

শোনা যায় ঐ হলুদ বাড়িটা অনেক কাল আগে এক জার্মান সাহেবের ছিল। দেশ স্বাধীন হবার পর তিনি এই বাড়িটা বেচে দিয়ে চলে যান।

ডেলোর পথে যাবার সময় যেখানে রাস্তাটা বাঁক নিয়েছে সেখানে দাঁড়ালেই ঐ হলুদ বাড়ির ম্যাগ্নোলিয়া গ্যাণ্ডিফ্লোরা বাগানের কিছু অংশ চোখে পড়বে। তার পিছনেই ইউক্যালিপটাস গাছের সারি। তারও পিছনে ধ্যানগম্ভীর বিশাল পাহাড় মৌন হয়ে দাঁড়িয়ে আছে।

ভারী নির্জন এই অঞ্চলটা। শুধু পাখির ডাক ছাড়া আর কিছু শোনা যায় না। হলদে বাড়ির ভিতরটাও ছবির মতো সাজানোগুছানো। বাড়ির বাগানে কত রংবেরঙের ফুল ফুটেছে, ইজি হিল, আমেরিকান বিউটি। এই সবই গোলাপ। এ ছাড়া নানা ধরনের ডালিয়া, জিনিয়া চন্দ্রমল্লিকা, কোচিয়া ফিলাডেলফিয়ার বাহারও কম নয়। সদর দরজার একেবারে পাশেই পুন্নাগ গাছে সাদা সাদা ফুল ফুটে রয়েছে। এই ফুলের সৌরভে চারদিক আমোদিত হয়ে উঠছে।

বাড়ির পূর্ব দিকের ঘরের সমস্ত জানালা-দরজা কাচ দিয়ে তৈরী। একটু লক্ষ্য করলেই দেখা যাবে সেখানে গেঞ্জির উপর কালো কোট চাপিয়ে একজন দাঁড়িওয়ালা বৃদ্ধ ভদ্রলোক মনোযোগ দিয়ে কি যেন দেখছেন। ওঁর মুখে বিলিতি পাইপ। পাশের টেবিলে একজন প্রৌঢ়, বয়স বছর পঁয়তাল্লিশের বেশি হবে না, কমপিউটার নিয়ে একটা জটিল সমস্যার সমাধানে ব্যস্ত।

বাড়িতে এই দু'জন প্রাণী ছাড়া আরও একজন রয়েছে। তার নাম নটবর। নটবর সম্ভবত এখন ব্রেকফাস্ট তৈরী করছে নিচের ঘরে।

দাড়িওয়ালা বৃদ্ধ ভদ্রলোকের নাম ডক্টর জ্ঞানেশ পাকড়াশী। উনি একজন বিখ্যাত বিজ্ঞানী। মহাকাশে নক্ষত্রের গতিবিধি, তাদের জন্মরহস্য ও মৃত্যু নিয়ে তাঁর গবেষণা সারা দুনিয়ায় একেবারে আলোড়ন তুলেছে। মরগ্যান সাহেব ও পুলিৎকারের সঙ্গে তাঁর জয়েন্ট পেপারটা নিয়ে বলতে গেলে বৈজ্ঞানিক মহলে এখন রীতিমত হৈ চৈ হচ্ছে। ডক্টর পাকড়াশী কাজের লোক

—নিঃশব্দে কাজ করে যেতেই তিনি বেশি আনন্দ পান। হৈ চৈ করে সময় নষ্ট করার মতো অবসর তাঁর মোটেই নেই।

প্রণব পূর্ব দিকের কাচের জানালাটা খুলে দিতেই ডক্টর পাকড়াশীর সঙ্গে ও'র কথোপকথন শোনা গেল।

ডক্টর পাকড়াশী—প্রণব, তোমার প্রব্লেমটা সলভড্ হয়ে গেলে আমায় দেখিও। ওটা আজই টাইপ করে ডেনমার্কে পাঠাতে হবে। আমি আপততঃ রেডিও টেলিস্কোপের ওখানে যাচ্ছি। প্রণব ঘাড় নেড়ে সম্মতি জানাল।

ডক্টর পাকড়াশী ঘর থেকে বেরুতে যাবেন এমন সময় নটবর ব্রেকফাস্ট এনে বলল: আগে সকালের খাওয়া দাওয়া সেরে নিয়ে তারপর যেখানে খুশী যাও বাপু।

নটবরের মেজাজটা বরাবরই একটু চড়া। অনেক দিনের চাকর, তাই মনিবকেও বড় একটা মানে-টানে না। এবার সে প্রণবের দিকে তাকিয়ে বলল—'ওহে দূরবীন বাবু তাড়াতাড়ি খাওয়া-দাওয়া সেরে নাও তো—আমার বিস্তর কাজ বাকি পড়ে আছে।'

প্রণব দিনরাত দূরবীনে চোখ লাগিয়ে কি সব দেখে, তাই নটবর ওকে বলে 'দূরবীন বাবু'।

সে যাই হোক, নটবরের কথায় কাজ হলো। দুজনেই ব্রেকফাস্ট খেতে শুরু করলেন।

এখানে প্রণবের একটু পরিচয় জেনে রাখা ভাল। সে গণিতের কৃতী ছাত্র, তবে জ্যোতির্বিদ্যায় কৌতূহলের অন্ত নেই। প্রণবের ধারণা মহাকাশে পৃথিবীর চাইতেও বুদ্ধিমান প্রাণী রয়েছে এবং তাদের সঙ্গে যোগাযোগ করে মহাকাশের অনেক কিছু নতুন তথ্য আবিষ্কার করা যাবে। ডক্টর পাকড়াশী এবং প্রণব দুজনের কেউই বিয়ে-থাওয়া করেন নি অর্থাৎ চিরকুমার। প্রণবের কাজই হচ্ছে দিনরাত চোখে দূরবীন লাগিয়ে কি সব দেখা।

আজ সকালে ডক্টর পাকড়াশী শিকাগোর এডিংটন সাহেবের কাছ থেকে একটা চিঠি পেয়েছেন। এই বিখ্যাত জ্যোতির্বিদ ডক্টর পাকড়াশীর বহু কালের বন্ধু। উনি লিখেছেন ব্ল্যাক হোল আর নিউট্রন তারা নিয়ে তিনি এক আশ্চর্য জিনিস মহাকাশে আবিষ্কার করেছেন। রিসার্চ পেপার ছাপাবার আগে তিনি সেটা পাকড়াশীকে দেখাতে চান। কাজেই এই চিঠি পাওয়ামাত্র পাকড়াশী যেন শিকাগো অভিমুখে রওনা দেন। বেলজিয়ামের ব্রাসেলস শহরে একটা ইনটারন্যাশনাল কনফারেন্স শুরু হচ্ছে কিছু দিনের মধ্যেই। তাতেও যোগ দেবার কথা বলা হয়েছে চিঠিতে। সঙ্গে দিয়েছেন এরোপ্লেনের রিটার্ন টিকিট।

হাতের কাছের ছোটখাটো কাজগুলো তাড়াতাড়ি সেরে নিলেন বৃদ্ধ বিজ্ঞানী। কাল রাতে তিনি মহাকাশের পালসার আর কোয়াসার থেকে যে দুটো অদ্ভুত রহস্য-জনক সংকেত পেয়েছেন সেগুলো বিস্তারিতভাবে নোট করে আয়রন সেলফের মধ্যে ঢুকিয়ে রাখলেন। এই আয়রন সেলফে তাঁর গত এক বছরের উল্লেখযোগ্য আবিষ্কারের সমস্ত রিসার্চ পেপারগুলো রয়েছে। একমাত্র প্রণব ছাড়া এ কথা আর কেউ জানে না। এই সেলফের চাবি অবশ্য সব সময় ডক্টর পাকড়াশীর কাছেই থাকে। শিকাগো যাবার সময় এগুলো সঙ্গে নিয়ে যেতে হবে।

প্রণব থাকে কালিম্পং থেকে সামান্য একটু দূরে যেখানে সুইন ডায়ারী রয়েছে তার কাছে। সন্ধ্যের আগেই সে ডক্টর পাকড়াশীর ল্যাবরেটরী থেকে রোজ পায়ে হেঁটেই রওনা দেয়। গুন গুন করে গান গাইতে গাইতে সারাটা পথ যেতে তার ভালই লাগে।

সন্ধ্যে হতে এখন আর বেশি দেরি নেই। প্রণব ঘরের আলো নিভিয়ে তারপর রিসার্চ রুমে তালাচাবি দিয়ে চাবিটা ডক্টর পাকড়াশীর ড্রয়ারে রেখে বড় রাস্তার দিকে রওনা হলো। পাহাড়ী আঁকাবাঁকা পথ। দেখতে দেখতে প্রণব অন্ধকারে মিলিয়ে গেল।

নটবর রান্না-বান্না সেরে টিভির সামনে গিয়ে বসল। আজ রাতে বাংলাদেশ থেকে চার্লি চ্যাপলিনের 'দ্য কিড' ছবি দেখানো হবে। চ্যাপলিনের ছবি দেখতে নটবরের ভীষণ ভালো লাগে।.....

খুব ভোরে ডক্টর পাকড়াশী তাঁর আয়রন সেলফ খুলে তো অবাক! গত এক বছর ধরে তিনি মহাকাশের যে সব নতুন থিয়োরী আবিষ্কার করেছিলেন তার সব কিছু বেমালুম বেপাত্তা হয়ে গিয়েছে। কেবল একটা জটিল গণিতের সমাধান ওখানে পড়ে রয়েছে। তাড়াতাড়িতে এটা হয়তো চোর নিতে পারে নি অথবা কোনও কারণে ওটা পড়ে গেছে। ডক্টর পাকড়াশী গণিতের সমাধানটা নেড়ে চেড়ে দেখলেন। আয়রন সেলফ বাইরে থেকে বন্ধ রয়েছে। তা হলে ভোজবাজির মতো সব ওখান থেকে উড়ে গেল কি করে? অবশ্য সেটাই আসল রহস্য। ডক্টর পাকড়াশী এ ব্যাপারে নিশ্চিত যে গতকাল রাত্রেই এই চুরিটা হয়েছে।

নটবরকে হাঁকডাক দিয়ে আনলেন তিনি। কিন্তু নটবরও অবাক! এ ব্যাপারের বিন্দুবিসর্গও সে জানে না। কাল সন্ধ্যাবেলায় ল্যাবরেটরীর সব কিছু বন্ধ করে প্রণব বাড়ি চলে গেছে। যাবার সময় চাবির গোছা রোজকার মতো ডক্টর পাকড়াশীর ডানদিকে ড্রয়ারে রেখে দিয়েছে—নটবরের তা নিজের চোখে দেখা। তবে?

প্রণবের আসতেও এখনও প্রায় 'দু' ঘণ্টা বাকি। সে

পরিশ্রমী ও সৎ ছেলে। ডক্টর পাকড়াশীর স্থির বিশ্বাস এ কাজ প্রণব করতে পারে না। তা হলে বাকি রইল বাড়ির আর একজন প্রাণী। সে হচ্ছে নটবর। কিন্তু নটবর বহু দিনের বিশ্বস্ত ভৃত্য। আর তা ছাড়া পাই, সাই, এপসাইলন, সাইন থিটা কস থিটা—এসব হিজি-বিজির মাথামুণ্ডু সে বুঝবেই বা কেমন করে?

ডক্টর পাকড়াশীকে খুবই বিমর্ষ দেখাচ্ছে। এই কাগজগুলোর মধ্যে একটা অতি মূল্যবান রিসার্চ পেপার ছিল। এবার তিনি 'সায়েন্টিফিক আমেরিকান' পত্রিকায় সেটা বের করবেন বলে ঠিক করেছিলেন। আবার নতুন করে হয়তো লেখা যায়, কিন্তু তাও যথেষ্ট সময়সাপেক্ষ ব্যাপার।

.....ক্রিং...ক্রিং...ক্রিং। বাইরে কলিংবেল বেজে উঠল। নটবর দরজা খুলে দিতেই একগাল হেসে যে ভদ্রলোক ভিতরে ঢুকলেন তাঁর নাম মিঃ হেনরিক। ডক্টর পাকড়াশীর পুরনো বন্ধু। কার্শিয়াং-এ থাকেন। ও'র আদি নিবাস বেলজিয়ামে। তবে কিছু দিন হলো ভারতবর্ষের, বিভিন্ন জায়গায় প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন সংগ্রহ করতে ব্যস্ত। আরকিওলজি বা প্রত্নতত্ত্ব নিয়ে গবেষণা করলেও মহাকাশবিজ্ঞানে ও'র আগ্রহের কথা সবাই জানে। দু' বছর আগে লণ্ডনের এ্যাস্ট্রোনমিক্যাল জার্নাল-এ মিঃ হেনরিকের প্রবন্ধ—ইনটেলিজেন্ট ক্রিচার ইন দ্য স্পেস' সারা দুনিয়ায় আলোড়ন তুলেছিল। চমৎকার বাংলা বলতে পারেন।

মিঃ হেনরিক—'কি হে ডক্টর তোমার রিসার্চ চলছে কেমন? বাইরে কোনও কনফারেন্সে যাবার কথা আছে নাকি?

ডক্টর পাকড়াশী মাথা নেড়ে বললেন—আরে ভাই, মহাকাশ নিয়ে আমার গবেষণার কাগজপত্তরগুলো আয়রন সেলফ থেকে কে যেন চুরি করে নিয়েছে। এদিকে আয়রন সেলফ দেখছি বাইরে থেকে বন্ধ ..

মিঃ হেনরিক—বল কি হে ভাই। এ যে দেখছি রীতিমতো ডিটেকটিভ গল্প!

ডক্টর পাকড়াশী—হ্যাঁ, তাই বটে। এদিকে শিকাগো থেকে এডিংটন সাহেব আমাকে যেতে লিখেছিলেন। প্লেনের টিকিটও পাঠিয়ে দিয়েছেন সেই সঙ্গে। এখন কাগজপত্তর কিছু না নিয়ে সেখানে গিয়ে কি হবে তাই ভাবছি।

মিঃ হেনরিক—ইনভাইটেশন যখন পাঠিয়েছে তখন যাওয়াই তো উচিত। দেশের নাম তুমি উজ্জ্বল করছ—এ তো আমাদের পরম সৌভাগ্যের কথা!

ডক্টর পাকড়াশী—দেখি শেষ পর্যন্ত কি করতে পারি। তুমি যদি আমার এখানে কিছুদিন থেকে যাও তো খুব ভাল হয়। কিছু ল্যাবরেটরীর কাজ আছে। আমি দেখিয়ে দেব কি কি করতে হবে। দরকার হলে প্রণবও তোমাকে সাহায্য করতে পারে। আমি শিকাগো থেকে ফিরে এলে তোমার ছুটি।

মিঃ হেনরিক—তোমার এই চমৎকার বাগানবাড়িতে অতিথি হতে আমার বিন্দুমাত্র আপত্তি নেই। তবে নটবরকে রোজ রাত্তিরে চিকেনরোস্ট বানাবার অ্যাডভাইস দিয়ে যেও।

ডক্টর পাকড়াশী ঘাড় নেড়ে সম্মতি জানিয়ে মৃদু হেসে বললেন—তাই হবে।

আজ ডক্টর পাকড়াশী কোলকাতা হয়ে শিকাগো যাত্রা করলেন। বাগডোগরা এয়ারপোর্টে মিঃ হেনরিক আর প্রণব তাঁকে বিদায় জানাতে গিয়েছিল। দুর্ভাগ্যের বিষয় বিদেশযাত্রার মূল্যবান রিসার্চের কাগজপত্র তিনি কিছুই সঙ্গে নিয়ে যেতে পারলেন না। কে যে আয়রন সেলফ থেকে ওটা হাত-সাফাই করেছে তাও অজানা রয়ে গেল।

এয়ারপোর্ট থেকে প্রণব সোজা চলে গেল দার্জিলিঙ। সেখানে দু'একদিন বেড়াবে সে। মিঃ হেনরিক চললেন কালিম্পং-এর পথে—ওঁকে ডক্টর পাকড়াশীর বাড়িতে কয়েকদিন থাকতে হবে।

রাত্তিরে অঝোরধারায় বাদল নেমেছে। চারদিকে শুধু বৃষ্টির ঝিমঝিম শব্দ ছাড়া আর কিছু শোনা যায় না। —সুকুমার সরল পাঠক, এবার আমার সঙ্গে নির্ভয়ে এস সেই রিসার্চ পেপারগুলোর চুরির হদিশ করা যাক।

ডানদিকের বারান্দা দিয়ে দেখা যাচ্ছে কালো ওভার-কোট-পরা একজন প্রৌঢ়কে দ্রুত ডক্টর পাকড়াশীর ঘরের দিকে এগিয়ে যেতে। আমরা পিছন থেকে দেখছি—তাই ওর মুখটা দেখা গেল না। অনেকগুলো চাবি পর পর ঘুরিয়ে সে আয়রন সেলফটাকে হঠাৎ খুলে ফেলল। তারপর টর্চ দিয়ে কি যেন একটা খোলা কাগজ ড্রয়ারের ভেতর থেকে বের করে পকেটে ঢুকাল। তারপর আস্তে আস্তে আয়রন সেলফের দরজা বন্ধ করে চাবি দিয়ে তেমনি দ্রুত পদে অন্ধকারে কোথায় যে মিলিয়ে গেল—তা কেউ জানতে পারল না।

ঘরের সামনে দরজার একপাশে নটবর তখন অঘোরে ঘুমোচ্ছে, আর মাঝে মাঝে নাসিকা গর্জন করছে। বাইরে তখনও মুষলধারায় ঝরঝর বৃষ্টি পড়ে চলেছে।

ঠিক দশদিন পরে ফিরে এলেন ডক্টর পাকড়াশী।

ওঁর ঘরে গিয়ে ডার্করুমে কয়েক ঘণ্টা কি সব করে তারপর তিনি একেবারে গম্ভীর হয়ে গেলেন।

মিঃ হেনরিক বললেন—তা হলে এবার আমার ছুটি। আমি যেতে পারি?

ডক্টর পাকড়াশী শান্ত গলায় বললেন—হ্যাঁ বন্ধু, আপনি এবার যেতে পারবেন। তবে আমার একটা অনুরোধ, আপনার বাঁ দিকের কোটের পকেটে আমার যে সব রিসার্চ পেপারগুলো রয়েছে, সেগুলো দয়া করে রেখে দিয়ে যাবেন।

মিঃ হেনরিকের চোখমুখ লাল হয়ে উঠল। চিৎকার করে তিনি বলে উঠলেন—আ-আমি, কি বলছেন ডক্টর পাকড়াশী -

ঠিকই বলেছি—দৃঢ়স্বরে উত্তর দিলেন ডক্টর। 'আপনি আমার রিসার্চ পেপারগুলো আত্মসাৎ করেছিলেন। কিন্তু প্রথম রাত্তিরে ঐ কাগজগুলোর সঙ্গে গণিতের একটা মূল্যবান 'ইকুয়েশন' আয়রন সেলফের ড্রয়ারে কোনও রকমে পড়ে গিয়েছিল—আপনি তা বুঝতে পারেন নি। আর ঐ ইকুয়েশনটা নেবার জন্যেই আপনি আবার এখানে এসেছিলেন। আমার সারা পরিশ্রমের ফসল আপনি তুলবেন আর তামাম দুনিয়ার লোক আপনাকে সেরা বিজ্ঞানী বলে বাহবা দেবে—এমন তো হতে পারে না। অপরের রিসার্চ পেপার চুরি করে আর যাই হোক বিজ্ঞানী হওয়া যায় না মিঃ হেনরিক।

—'প্রমাণ কি আছে আপনার কাছে যে আমিই আপনার রিসার্চ পেপারগুলো নিয়েছি?'—চিৎকার করে বলে উঠলেন মিঃ হেনরিক। তাঁর বিস্ফারিত রক্তবর্ণ চক্ষু দেখলে গায়ের রক্ত হিম হয়ে আসে।

—'এই ফটোগুলো কি মিথ্যে?' এই বলে ডক্টর পাকড়াশী কতকগুলো ছবি তুলে ধরলেন মিঃ হেনরিকের চোখের সামনে।

—'ভেবেছিলেন বুঝি অন্ধকার ঘর থেকে ডুপ্লিকেট চাবি দিয়ে কাজ সাফাই করবেন—কেউ ঘুণাক্ষরে তা টেরও পাবে না। কিন্তু সে গুড়ে বালি দিয়েছে আমার 'ইনফ্রা রেড ক্যামেরা'। অন্ধকারেও নিঃশব্দে আপনার সমস্ত ক্রিয়াকলাপের ছবি তুলে জলের মতো আমায় জানিয়ে দিয়েছে। শিকাগো যাবার আগে অপরাধী যে আবার ফিরে আসবে এই বিশ্বাসে ইনফ্রা রেড ক্যামেরাকে আমি ওই ঘরে রেডি করে রেখেছিলাম। তবে আপনার মতো একজন বন্ধু স্থানীয় সম্পন্ন ব্যক্তি যে একাজ করতে পারে—এ কথা আমি স্বপ্নেও ভাবিনি।'

মিঃ হেনরিক এবার নিঃশব্দে তাঁর পকেট থেকে রিসার্চ পেপারগুলো বার করে টেবিলের উপর রেখে মুখ নীচু করে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন। সূর্য তখন কালিম্পংয়ং পাহাড়ের গায়ে লাল আভা ছড়িয়ে দিয়ে অস্তাচলে যেতে বসেছে।

নটবর এতক্ষণ পরে সমস্ত ঘটনা বুঝতে পেরে দু'হাত তুলে নৃত্য শুরু করে দিল।

জীবন বিজ্ঞানের প্রথম পাঠ-16

তারকমোহন দাস

সালোকসংশ্লেষ প্রসঙ্গে একটি মূল প্রশ্নের উত্তর দেওয়া দরকার তা হলো সালোকসংশ্লেষের মূল রাসায়নিক প্রকৃতিটি কি? সংক্ষেপে সালোকসংশ্লেষ বিক্রিয়াটি লেখা হয়ঃ

$$6CO_2 + 6H_2O \xrightarrow[\text{সবুজকণা}]{\text{আলো}} C_6H_{12}O_6 + 6O_2$$

এটি মূলত একটি জারণ-বিজারণের বিক্রিয়া। এই বিক্রিয়ায় জলের অণু জারিত হয় এবং কার্বন ডাই-অক্সাইডের অণু বিজারিত হয়। জলের অণু থেকে হাইড্রোজেন পরমাণু মুক্ত হয়ে ঐ হাইড্রোজেন কার্বন ডাইঅক্সাইডের অণুর সঙ্গে যুক্ত হবার ফলেই এটা ঘটে। সালোকসংশ্লেষ একটিমাত্র বিক্রিয়া নয়—অনেকগুলি বিক্রিয়ার সমষ্টিমাত্র। এই বিক্রিয়াগুলিকে প্রধানত দুটি ভাগে বা দুটি পর্যায়ে ভাগ করা যেতে পারে। যেমন আলোক দশা (Light Phase)। আলোকশক্তির সাহায্যে যে বিক্রিয়া ঘটে তা আলোক-দশার অন্তর্গত এবং অন্ধকার (Dark phase) দশা আলোকশক্তির সহায়তা ছাড়াই যে বিক্রিয়া ঘটে তা অন্ধকার দশার অন্তর্গত। উদ্ভিদের সবুজ অংশে ক্লোরোপ্লাস্টের মধ্যে যে জল থাকে তা প্রথমে সূর্যরশ্মির প্রভাবে হাইড্রোজেন ও হাইড্রক্সিল আয়নে বিশ্লিষ্ট হয়, এটিকে 'ফটোলিসিস্' বলে, এটি আলোক-দশার অন্তর্গত। তারপর বাতাসের কার্বন ডাইঅক্সাইড গ্যাস পাতার রন্ধ্রের মধ্য দিয়ে ক্লোরোপ্লাস্টের মধ্যে প্রবেশ করে গ্লুকোজ শর্করা সৃষ্টি করে। এটি অন্ধকার দশার অন্তর্গত, এখানে সূর্যরশ্মির প্রয়োজন হয় না। পরিশেষে যে হাইড্রক্সিল আয়ন জল থেকে বিশ্লিষ্ট হয়েছিল তার অক্সিজেনের ভাগ পাতার ঐ রন্ধ্র পথেই বাতাসে নির্গত হয়। সুতরাং সালোকসংশ্লেষ বিক্রিয়ার ফলে বাতাসে যে অক্সিজেন যোগ হয় তার সবটাই আসে জল থেকে।

একটি গাছ সূর্যের আলোয় যখন সালোকসংশ্লেষ করে, তখন বাতাসে অক্সিজেন যোগ করে, এই অক্সিজেনের সে যোগান দেয় জলের অণু ভেঙ্গে। কিন্তু কতটা অক্সিজেন সে দেয়? উইলিয়ম এনড্রুজ সম্পাদিত Environmental Pollution গ্রন্থ থেকে আমরা জানতে পারি, একটি ম্যাপল গাছ প্রতিদিন 6·7 পাউণ্ড অক্সিজেন যোগ করে, অর্থাৎ প্রতি বছরে সে যোগ করে 2445·5 পাউণ্ড বা এক মেট্রিক টনের সামান্য কিছু বেশি। এই এক টন অক্সিজেন, এর পরিমাণ এবং মূল্য বড় অল্প নয়, একটি গাছের কাছ থেকেই আমরা প্রতি বছর তা পেতে পারি। ঐ ম্যাপল গাছটি আবার প্রতিবছর সালোকসংশ্লেষ ক্রিয়ায় দেড় টনের মত দূষিত কার্বন ডাইঅক্সাইড বাতাস থেকে টেনে নিয়ে বাতাসকে পরিশোধিত করে। সালোকসংশ্লেষ বিক্রিয়ার এটি একটি প্রধান তাৎপর্য।

সালোকসংশ্লেষ বিক্রিয়ার অন্যতম তাৎপর্য হলো এই বিক্রিয়ায় শক্তির রূপান্তর ঘটে থাকে। সূর্যরশ্মির সঙ্গে যে অফুরন্ত শক্তি পৃথিবীতে আসে তার অতি সামান্য ভগ্নাংশ, শতকরা এক ভাগেরও কম, এই সালোকসংশ্লেষ বিক্রিয়ায় রাসায়নিক শক্তিরূপে খাদ্যের মধ্যে জমা হয়। আলোক-শক্তি এখানে রাসায়নিক শক্তিতে রূপান্তরিত হচ্ছে। সূর্যের আলো ছাড়াও প্রখর বৈদ্যুতিক আলোতেও এই সালোকসংশ্লেষ ঘটতে পারে, অর্থাৎ এইভাবে শক্তির রূপান্তর ঘটতে পারে। জীবেরা জৈব খাদ্য খেয়ে ঐ রাসায়নিক শক্তি অন্যান্য শক্তিতে রূপান্তরিত করে। আমরা কাঠ পুড়িয়ে, কয়লা জ্বালিয়ে ঐ শক্তি নিজেদের নানারকম কাজে লাগাই।

আমাদের দেশের প্রতি হেক্টর (100 × 100 মিটার) জমিতে প্রতিদিন গড়ে চল্লিশ কোটি কিলো-ক্যালোরি শক্তি সূর্যকিরণের সঙ্গে এসে পৌঁছায়। এই শক্তির সবটাই যদি ধানের বা গমের শিষের মধ্যে আবদ্ধ হত তা হলে ঐ জমি থেকে প্রতিদিন তের হাজার মানুষের অন্ন-সংস্থান হতে পারত (প্রতিদিন মাথা পিছু তিন হাজার ক্যালোরি হিসেবে খাদ্য বিতরণ করে)। কিন্তু আগেই বলা হয়েছে, উদ্ভিদের সালোকসংশ্লেষ করবার ক্ষমতা খুবই সামান্য। যতটা সৌরশক্তি শস্যক্ষেত্রের ওপর পড়ে তার শতকরা এক ভাগেরও কম ধান বা গমের গাছ নিজেদের দেহের মধ্যে আবদ্ধ করে রাখতে পারে। তা ছাড়া আমরা ধান বা গম গাছের পাতা, কাণ্ড বা শেকড় খাই না, খাই শুধু বীজ বা দানা। সুতরাং যে সামান্য শক্তি ধান গম গাছ ধরে রাখে তার শতকরা এক থেকে দশভাগের বেশি শক্তি ঐ গাছের কাছ থেকে আমাদের পক্ষে পাওয়া সম্ভব নয়। তাই বাস্তব ক্ষেত্রে দেখা যায়, ঐ এক হেক্টর জমি থেকে চিরাচরিত পদ্ধতিতে চাষ করলে তিন-চারজনের বেশি মানুষের অন্ন-সংস্থান সম্ভব হয় না। কিন্তু উন্নত

পদ্ধতিতে অধিক ফলনশীল শস্য চাষ করলে এবং বছরে দুবার করে চাষ করলে ঐ জমি থেকেই প্রতিদিন 27 জনের মতো অন্ন-সংস্থান হতে পারে। কিন্তু 27 সংখ্যাটিও বড় সাম্যান্য নয়। ভারতে চাষযোগ্য জমির পরিমাণ হলো 16 কোটি 13 লক্ষ হেক্টর, একে 27 দিয়ে গুণ করলে দাঁড়ায় 435 কোটি 51 লক্ষ। এই সংখ্যাটি ভারতের বর্তমান জনসংখ্যার ছয় গুণেরও বেশি। ভারতের বর্তমান জনসংখ্যা 68 কোটি বা 680 মিলিয়ন। তা হলে ব্যাপারটা দাঁড়াচ্ছে ভারতে যত চাষযোগ্য জমি আছে তার সবটাই যদি উন্নত পদ্ধতিতে অধিক ফলনশীল শস্য বছরে দুবার করে চাষ করা যায় তা হলে ভারতের বর্তমান জনসংখ্যার ছয় গুণেরও বেশি এক অতি বিরাট জনসমষ্টির উপযুক্ত খাদ্য উৎপাদন করা সম্ভব।

কাগজেকলমে এটা সম্ভব হলেও বাস্তবে এটা সম্ভব নয়। কেননা এই বিপুল পরিমাণে খাদ্য উৎপাদন করতে হলে যে জল, সার ও জ্বালানী শক্তি দরকার তা আমাদের নেই। এটা হিসাব করে দেখা গেছে, কৃষিক্ষেত্রের ফসল থেকে আমরা যতটা শক্তি পাই, তার প্রায় শতকরা 50 ভাগ আমাদের কৃষিক্ষেত্রে বিনিয়োগ করতে হয় আমাদের নিজেদের সঞ্চয় থেকে, কয়লা পুড়িয়ে কিংবা পেট্রল বা ডিজেল জ্বালিয়ে সেচের পাম্প, ট্রাক্টার, পরিবহন,, সার ও কীট-নাশক দ্রব্য তৈরীতে। কিন্তু জ্বালানীর মূল্য আজ অসম্ভব হারে বেড়ে চলেছে এবং তার যোগান ক্রমশঃই অনিশ্চিত হয়ে উঠছে। আগামী শতাব্দীতে পেট্রোলিয়ামের ভাণ্ডার নিঃশেষ হয়ে যাচ্ছে, কয়লার যোগানও ক্রমশঃ কমতে কমতে কয়েক শতাব্দীর পরে সম্পূর্ণ বন্ধ হয়ে যাবে। ইতিমধ্যেই শস্যের ফলন লক্ষ্যমাত্রা থেকে কমে গেছে, জ্বালানীশক্তির অনটনের জন্যেই এটা ঘটেছে। সুতরাং ভারতের জনসংখ্যা বাড়লে তার সঙ্গে সঙ্গতি রেখে যে খাদ্যের ফলন বাড়ানো যাবে, এ সম্পর্কে বিশেষজ্ঞদের মনে যথেষ্ট সন্দেহ আছে।

এই প্রসঙ্গে অনেকে বিকল্প খাদ্যের কথা চিন্তা করে থাকেন। কতকগুলি জলজ উদ্ভিদের সালোকসংশ্লেষ করবার ক্ষমতা আশ্চর্যরকম বেশি। এককোষী জলজ সবুজ শ্যাওলা ক্লোরেলা প্রতি বারো ঘণ্টা অন্তর দেহের আয়তন দ্বিগুণ করতে পারে। এক একর জমি জল-প্লাবিত করে যদি তাদের চাষ করা হয় তা হলে প্রতি বছর চল্লিশ টনের ওপর ক্লোরেলা উৎপন্ন করা সম্ভব। ঐ পরিমাণ জমিতে। কিন্তু এক টনের বেশি খাদ্যশস্যের উৎপাদন আমরা আশা করতে পারি না। ক্লোরেলার মধ্যে শর্করা ছাড়া প্রোটিন ও ভিটামিন যথেষ্ট আছে। ক্লোরেলা সারা বছর চাষ করা যায়, অন্যান্য শস্য সেখানে বছরে একবার বা দুবারের বেশি চাষ করা যায় না। তা ছাড়া অন্যান্য শস্যের কাণ্ড, পাতা বা শেকড় খাওয়া যায় না, ক্লোরেলার সবটাই খাওয়া চলে। তবে ক্লোরেলার স্বাদ ও গন্ধ তেমন মুখরোচক নয়। ইতিমধ্যেই ক্লোরেলার সাহায্যে বিস্কুট, জিলেটিন, স্যালাড, ও আইসক্রিম তৈরী হচ্ছে। ডিমের তৈরী এক ধরনের খাবার ও মাছরান্নার সঙ্গে ক্লোরেলার ব্যবহার চলছে। জাপানে ও রাশিয়ায় ক্লোরেলার ব্যবহার ক্রমশঃ জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে। কিন্তু খাদ্যশস্যের ব্যাপক ঘাটতি ক্লোরেলার সাহায্যে পূরণ হওয়া শক্ত। তা ছাড়া ক্লোরেলার চাষেও বিপুল পরিমাণ সার, জল ও জ্বালানীশক্তি দরকার হয়। অনেকে জ্বালানীশক্তির বদলে সৌরশক্তির ওপর ভরসা করে আছেন, কিন্তু অদূর ভবিষ্যতে সুলভে ব্যাপকহারে সৌরশক্তি পাওয়ার সম্ভাবনা খুব উজ্জ্বল নয়।

সুতরাং এই পরিস্থিতিতে যে পন্থাটি সবচেয়ে কার্যকর বলে বিশেষজ্ঞরা মনে করেন তা হলো দেশের মোট খাদ্য ও শক্তির সঙ্গে সঙ্গতি রেখে জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রিত রাখা। এটি বাস্তবিক পক্ষে প্রকৃতির নিজস্ব পন্থা। আড়াইশো কোটি বছর ধরে এই পন্থা অবলম্বন করেই জীবজগৎ পৃথিবীতে টিকে আছে এবং ধীরে ধীরে সমৃদ্ধ হয়ে উঠেছে। প্রকৃতির মধ্যে দেখা যায়, প্রাণীরা সব সময়ই উদ্ভিদজগতের সালোকসংশ্লেষ করবার সীমাবদ্ধ শক্তির কথা মেনে নিয়েই নানা বিস্ময়কর কৌশল অবলম্বন করে নিজেদের সংখ্যা নিয়ন্ত্রিত করে রাখে। আমাদেরও সালোকসংশ্লেষের এই সীমাবদ্ধতার মধ্যে নিজেদের মানিয়ে নিয়ে বেঁচে থাকতে হবে। একথাটা আমরা যত তাড়াতাড়ি বুঝতে পারি ততই আমাদের মঙ্গল।

বিশ্ববিদ্যালয় বিজ্ঞান কলেজ, 35 বালিগঞ্জ সারকুলার রোড, কলি—19

চাঁদ যখন ডুববে না

অপরাজিত বসু

ছোটবেলা ভাবতাম—দিনরাত আকশে যদি চাঁদ ঝুলে থাকতো তো কি মজাই না হত! কিন্তু তা কি সম্ভব? একদম অসম্ভব নয়, অন্ততঃ এখন না হোক, একদিন তো হবেই হবে। তোমাদের নিশ্চয়ই খুব কৌতুহল হচ্ছে ব্যাপারটা কি জানতে। কখন কেমন করে আকাশের দরজায় চিরকালের মতো চাঁদ বাঁধা থাকবে। সে কথাই বলছি।

তোমরা তো জানো, পৃথিবীর চারপাশে একবার ঘুরে আসতে চাঁদের সাড়ে ঊনত্রিশ দিন সময় লাগে। এই ঘুরে আসার পথে, চাঁদের যে দিকটা পৃথিবীর দিকে ফিরে থাকে, তাতে কখনো সূর্য্যের আলো পুরোপুরি পড়ে, কখনো আধখানা, কখনো সিকিখানা, কখনো বা একেবারেই পড়ে না। যেমন ধর পূর্ণিমার দিন। সেদিন পৃথিবীর দিকে ফিরে থাকা চাঁদের পিঠটা পুরোপুরি আলোকিত হয়—আকাশে ভাসতে থাকে একখানা আস্ত গোল চাঁদ। কিন্তু অমাবস্যার দিনে, পৃথিবীর দিকে ফিরে থাকা চাঁদের গায়ে একদম সূর্যের আলো পড়ে না। তাই অমাবস্যায় আমরা চাঁদ দেখতেও পাই না।

তোমাদের নিশ্চয়ই জানতে ইচ্ছে করছে, কেন চাঁদ সবসময় তার একটা দিক পৃথিবীকে দেখায়। তা হলে কি চাঁদ নিজের চারপাশে ঘুরপাক খায় না? চাঁদ কি শুধু পৃথিবীর চারপাশে ঘোরে। তার নিজের কোন আবর্তন নেই? তা নয়। আসলে, যে সময়ে চাঁদ পৃথিবীর চারপাশে এক পাক দেয়, ঠিক সে সময়ে সে নিজের চারদিকে একবার ঘুরে নেয়। এই সময়টা হলো সাড়ে ঊনত্রিশ দিন। এর মানে, পৃথিবীর চারপাশে ঘোরার দরুন চাঁদের পিঠ যতটা পৃথিবীর দিকে ফেরার কথা, ঠিক ততটা উল্টোদিকে ঘুরে যায় তার নিজের অক্ষে ঘোরার দরুন। এর জন্যে আমরা কখনোই চাঁদের ওপিঠ দেখতে পাব না।

খুব সহজ একটা উদাহরণ দিলে বিষয়টা বুঝবে। ধর, একটা গোল মাঠের মাঝে একটা আলো জ্বলছে। মাঠের চারধারে তুমি ঘুরছ। তুমি চাইছ, যাতে ঐ আলো সব-সময় তোমার মুখে পড়ে। এই আলো পেতে হলে ঘোরার সময় তোমাকেও ধীরে ধীরে ঐ আলোর দিকে মুখ ঘোরাতে হবে। যদি তুমি মুখ না ঘোরাও, তা হলে দেখবে এক সময় মুখের সামনের আলো তোমার পিছনে চলে গেছে।

পৃথিবীর অনেক ঘটনার পিছনে চাঁদের সরাসরি হাত আছে। যেমন ধর, সমুদ্রের জোয়ার-ভাঁটা। চাঁদের টানে সমুদ্রের জল ফুলে-ফেঁপে ওঠে—জোয়ারের জল ভাসিয়ে দেয় উপকূল, তটরেখা, নদীতীর। শুধু জল নয়, চাঁদ পৃথিবীর কঠিন ভূত্বককেও আকর্ষণ করে। তবে জলের মতো কঠিন ভূস্তর তো ফুলে-ফেঁপে উঠতে পারে না। বিজ্ঞানীরা মেপে দেখেছেন, চাঁদের আকর্ষণে পৃথিবীর ভূস্তরেও সামান্য নড়াচড়া দেখা যায়। জোয়ার ভাঁটা বা ভূস্তর ফাঁপা—এসব একেবারে ব্যর্থ হয় না। পৃথিবীর নিজ অক্ষে আবর্তন অর্থাৎ আহ্নিক গতির উপর (যার জন্যে দিনরাত হয়) এই ঘটনা বাধা বা ব্রেকের কাজ করে। অর্থাৎ চাঁদের আকর্ষণের পরোক্ষ ফল হচ্ছে—পৃথিবী ক্রমশ তার আহ্নিক গতি হারাচ্ছে। যত দিন যাচ্ছে তত একদিনের সময়কাল চব্বিশ ঘণ্টার বেশি হয়ে যাচ্ছে। বিজ্ঞানীরা হিসাব করে বলেছেন যে, এক লক্ষ বছরে পৃথিবীর দিনের মাপ এক সেকেণ্ড করে বাড়ছে।

আর একটা কথা, পৃথিবীর আহ্নিক গতি কমার জন্যে চাঁদ ক্রমশ পৃথিবী থেকে দূরে সরে যাচ্ছে। চাঁদ যত দূরে যাবে। তত পৃথিবীর চারপাশে ঘুরতে বেশি সময় লাগবে। এইভাবে এমন একদিন সময় আসবে, যখন পৃথিবী তার অক্ষে একবার ঘুরতে যে সময় নেবে, সেই সময়ে চাঁদ পৃথিবীর চারপাশে একবার ঘুরে আসবে। পৃথিবীতে দিন ও মাস একাকার হয়ে যাবে। আর তখনই পৃথিবীর একদিক থেকে আকাশে সব সময় চাঁদ দেখা যাবে। চাঁদ উঠবেও না, ডুববেও না। কি মজা!

তবে এখনই খুশি হবার তেমন কারণ নেই। বিজ্ঞানীরা হিসাব করে বলেছেন, এ সব হতে এখনও অনেক অনেক দিন বাকি। ততদিন কৃষ্ণপক্ষ-শুক্লপক্ষের চাঁদ নিয়ে আমাদের সন্তুষ্ট থাকতে হবে। কি বল?

B 16 / 8 কালিন্দী হাউসিং এস্টেট, কলি-89

হেনিং ব্রাণ্ডটের 'পরশ পাথর'

দিব্যেন্দু পানিগ্রাহী

মধ্যযুগের কোন এক পর্বে জার্মানীর হামবুর্গ শহরে হেনিং ব্রাণ্ডট নামে একজন বণিক বাস করতেন। ইনি রাতারাতি বড়লোক হবার স্বপ্ন দেখতেন। কি করে হওয়া যায়? কাজটি সোজা—শুধু সর্ববিদিত 'পরশ পাথর' জোগাড় করা। কিমিয়াবিদ্‌দের মতে তা দিয়ে খোয়া পাথরকেও সোনা করা যায়।

...বছরের পর বছর গেল, ব্রাণ্ডটের স্মৃতি ক্রমে ক্ষীণ হয়ে এলো। এই বছরগুলিতে তিনি হাজার রকমের খনিজ ও মিশ্রদ্রব্য গলিয়ে মিশিয়ে, ছেঁকে, তাতিয়ে তার হাত দুটি অ্যাসিড আর ক্ষারের দুরারোগ্য দাগে দাগে ভরে উঠল।

1669 খ্রীষ্টাব্দের কোন একদিনের শুভ সন্ধ্যায় তাঁর ভাগ্যদেবী সুপ্রসন্ন হলেন। তাঁর বকযন্ত্রের তলায় তুষার-সাদা একটি বস্তু জমে উঠল। ওটি দ্রুতদাহ্য এবং এর ঘন ধোঁয়া শ্বাসরোধী। আর এর সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হলো অন্ধকারে উজ্জ্বলতা। এই শীতল আলোয় ব্রাণ্ডট অক্লেশে তাঁর কিমিয়াবিদ্যার নিবন্ধাবলী পড়তে পারতেন।

এভাবে নেহাৎ ঘটনাক্রমে আবিষ্কৃত হলো ফসফরাস। এর অর্থ 'আলোক প্রকাশ'। এই অনুপ্রভা পদার্থটি সে সময় বিজ্ঞানীদের কাছে ছিল রহস্যময় বস্তু। ব্রাণ্ডট এই বস্তুটির ম্যাজিক দেখিয়ে ও এটি তৈরী করার উপায় বিক্রি করে বেশ কিছু রোজগার করেছিলেন। ব্রাণ্ডট প্রথমে 200 ডলার দামে ফসফরাস তৈরীর 'রহস্য ক্র্যাফট' নামে এক ব্যক্তিকে শিখিয়ে দেন। ক্র্যাফটও ফসফরাসের ভূতুড়ে রশ্মি দেখিয়ে বেশ কিছু সঞ্চয় করেন। ওই সময় কুঙ্কেল নামে আর এক জার্মান রসায়নবিদ নিজের চেষ্টায় ফসফরাস তৈরী করতে সক্ষম হন। কুঙ্কেলের কাছ থেকে আইরিশ বিজ্ঞানী বয়েল ফসফরাস তৈরী করার উপায় জানতে পারেন। 1680 খ্রীঃ বয়েল বৃহদায়তনে ফসফরাস তৈরী করার উপায় উদ্ভাবন করেন। সাদা ফসফরাস যে বায়ুর সংস্পর্শে স্বতঃস্ফূর্তভাবে জ্বলে ওঠে একথা জানা না থাকায় সে সময় চতুর্দশ লুইয়ের রাজ-চিকিৎসক নিজের বিছানায় ফসফরাস রাখার ফলে আগুনে পুড়ে মরবার উপক্রম হয়েছিলেন।

আগে মূত্রই ছিল ফসফরাসের উৎপাদনের একমাত্র উৎস। কিন্তু 1777 খ্রীষ্টাব্দে বিজ্ঞানী শিলি জীবদেহের হাড় পুড়িয়ে ফসফরাস তৈরী করতে সক্ষম হন। সেই বছর বিজ্ঞানী ল্যাভয়সিয়ার প্রমাণ করেন যে, ফসফরাস একটি মৌলিক পদার্থ এর সংকেত 'P', ও পারমাণবিক গুরুত্ব 31.

পর্যায়বৃত্ত সারণীর অন্যকোন প্রতিনিধিই আর এমন অনন্য বৈশিষ্ট্যের অধিকারী নয়। ফসফরাসের মূল্যবান ও তাৎপর্যপূর্ণ ধর্মের সংখ্যা বহু।

ফসফরাস ছাড়া প্রাণের অস্তিত্ব অসম্ভব। একে বাদ দিলে শ্বাসপ্রশ্বাস প্রক্রিয়া অচল হয়ে পড়বে, পেশীতে কোন শক্তিই জমা থাকবে না। আমাদের গুরু মস্তিষ্কের কোষকলা বহু জটিল ফসফরাস যৌগে বোঝাই। ফসফরাস যে কোন জীবেরই দেহসংস্থার অন্যতম জরুরী 'ইষ্টকস্বরূপ'। কারণ অস্থিকলার মূল উপাদান—ক্যালসিয়াম ফসফেট।

কিন্তু ফসফরাস ভাস্বর কেন?

সাদা ফসফরাসের উপর সব সময়ই ফসফরাস বাষ্পের মেঘ জমে থাকে। বাষ্পটি জারিত হয় ও প্রভূত শক্তি উৎকীর্ণ করে। এই শক্তিই ফসফরাস পরমাণুকে উত্তেজিত করে আর তাই আলোর ঝলকানি!

কুঠিয়া হাউসিং এষ্টেট, 1/G-5, কলকাতা—39

উদ্ভিদ ও জড়ের মধ্যে প্রাণের স্পন্দন আবিষ্কার!—পাশ্চাত্যের বিজ্ঞানীমহল চমকিত হলেন। লেফটেনান্ট গভর্ণর স্যার জে, উড্‌বার্ণ ব্যাপারটি আগ্রহের সঙ্গে প্রত্যক্ষ করলেন।
এ যে এক অদ্ভুত ব্যাপার দেখছি মিঃ বোস! এ আবিষ্কার অবশ্যই বিদেশে প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করা
হ্যাঁ, প্যারিসে শীঘ্রই একটা বিশ্ব প্রদর্শনীর আয়োজন হচ্ছে। সেখান থেকে আমার আমন্ত্রণ এসেছে, এখন আপনি যদি এ ব্যাপারে আমাকে সাহায্য করেন
বেশ। তবে এ বিষয়ে সেক্রেটারীর হাত—আচ্ছা দেখি কি করতে পারি
পরে ডিরেক্টারের কাছ থেকে যে চিঠিখানি হস্তগত হল, তাতে সেই ভারতীয়ের প্রতি ইংরেজদের হীনমন্যতাই প্রকাশিত হল
সব শুনে রবীন্দ্রনাথ স্থির থাকতে পারলেন না। স্বয়ং অর্থ সংগ্রহে নেমে পড়লেন। সঙ্গে রইলেন উড্‌বার্ণ।
অর্থাভাবে বন্ধুবরের প্যারিস যাওয়া বন্ধ হতে পারে না। বৌঠান আপনি যাবার সব আয়োজন করুন।
আপনি বন্ধুর জন্য এত ভাবেন?
কেন ভাবব না? আমি নিশ্চিত, এই আবিষ্কার পৃথিবীতে এক আলোড়ন সৃষ্টি করবে
১৯০০ সাল। শুরু হল প্যারিসে আন্তর্জাতিক বিজ্ঞান কংগ্রেস
সভাগৃহ লোকে লোকারণ্য
সভামঞ্চে উঠে দাঁড়ালেন ভারতীয় বিজ্ঞানী জগদীশচন্দ্র বসু। বিশ্ববাসীর সামনে তুলে ধরলেন এক অজ্ঞাত জগৎ।

খুদে বৈজ্ঞানিক

দিলীপ দাস

জলের মধ্যে যে বাতাস আছে, সেটা তোর বিশ্বাস হচ্ছে না-না? ওয়েট এ মিনিট। আমি প্রমাণ করে দিচ্ছি-
জলভর্তি এই বাটিটার মধ্যে জলভর্তি একটা গ্লাস উপুড় করে বসিয়ে দিলুম, কেমন?
সর্বনাশ! এটা যে পিসিমার দুধ জ্বাল দেবার বাটি! দেখতে পেলে-
চোপরও! - এরকম একটা বৈজ্ঞানিক আলোচনার মধ্যে পিসির কথা উঠছে কেন?
এখন গ্লাস সমেত বাটিটা আগুনের উপর বসাতে হবে। যা-স্টোভটা নিয়ে আয়।
বাঃ! এইবার দ্যাখ, হিটে জলস্থিত বাতাস বুদবুদাকারে বেরিয়ে আসছে এবং গ্লাসের জল সরিয়ে ঐ বাতাস ফাঁকা জায়গায় জমা হচ্ছে।
বুঝেছি-
যা - এবার তোর পিসির জিনিস পিসিকে দিয়ে আয়-
আর যেতে হবে না - এসে গেছেন!
বলি, এ সব গুষ্টির পিণ্ডি কি হচ্ছে শুনি? নতুন বাটিটা পুড়িয়ে কালো করে ফেলেছিস!
পিসিমা! খাঁদুকে একটা পরীক্ষা করে দেখাচ্ছিলুম, যে-
বাড়ির ঘটি-বাটি নিয়ে বৈজ্ঞানিকগিরি ফলান হচ্ছে- যতোসব উৎকুটে কান্ড!
খুব লেগেছে? তোকে একটু বাতাস করবো খুদে?

জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিচিত্র সংবাদ

বরুণ মজুমদার

পায়রা যখন রানার

পায়রার কথাতেই যখন এলাম, তখন দৌড়বীর পায়রার কথা বলছি। দৌড়বীর পায়রার জাত কিন্তু একেবারে আলাদা। এরা যে সে পায়রা নয়। বংশ

মর্যাদায় এরা কুলীন। এদের এক জাতের নাম দি ব্রিকসেম। ইউরোপের বিভিন্ন দেশে বিশেষ করে বৃটেন, ফ্রান্স, বেলজিয়ামে এই সব দৌড়বীর পায়রার খুব কদর আছে। দুটি ডানার ভর করে এই সব পায়রা শত শত মাইল উড়ে যায় ঝড়ের গতিতে। আর এথেকে চালু হয়েছে পায়রাদের দৌড় প্রতিযোগিতা। তেতাল্লিশ খৃষ্ট পূর্বাব্দে পায়রাকে বার্তাবাহকের কাজে লাগানো হয়েছিল ম্যাটিনা অবরোধের সময়। এর বেশ কয়েক বছর পরে পায়রাকে কাজে লাগিয়ে ইংলণ্ডের রাজা রিচার্ডের সেনাবাহিনীর গোপন খবর স্যারাসনরা জেনে নিয়েছিল। 1870-71 সালে প্যারিস অবরোধের ব্যাপারে চিঠি আদান-প্রদানের প্রধান মাধ্যম হিসাবে পায়রাকে কাজে লাগানো হয়েছিল। দি ব্রিকসেম জাতের একটা পায়রা 1975 সালে 31 ডিসেম্বর লিসেসস্টারের লুই মাথা রোহরা সাড়ে 10 হাজার পাউণ্ড অর্থাৎ দেড় লক্ষ টাকার বেশি দামে কেনেন। বৃটেন ও বেলজিয়ামে উনিশ শতকের শেষের দিকে দৌড় প্রতিযোগিতায় পায়রা জনপ্রিয় হয়ে ওঠেছিল। পঞ্চাশের দশকে পায়রা দৌড়ের আন্তর্জাতিক সংস্থা 'দি ফেডারেশন কলবোফিল ইণ্টারন্যাশনাল' গড়ে ওঠে। এর সদর দপ্তর হয় ব্রাসেলসে। এরা প্রতি দু বছর অন্তর আন্তর্জাতিক পায়রা দৌড় প্রতিযোগিতার ব্যবস্থা করেন, এতে প্রত্যেকটি সদস্য দেশ পাঁচটা পুরুষ ও পাঁচটা স্ত্রী পায়রা প্রতিযোগী হিসাবে পাঠায়। তবে একটা শর্ত থাকে। শর্তটা হলো পাঁচটা পুরুষ পায়রাকে আগের দু বছরের মধ্যে এক হাজার কিলোমিটার আর স্ত্রী পায়রাগুলোকে সাড়ে সাতশো কিলোমিটারের দৌড় প্রতিযোগিতায় বিজয়ী হতে হবে। ওলিম্পিক গেমসের নীতির মতো কোন্ দেশ পায়রাদের আন্তর্জাতিক দৌড় প্রতিযোগিতার আয়োজন করবে তা ঠিক হয়।

কলকাতায় 1978 সালে গঠিত ক্যালকাটা রেসিং পিজিয়ন অ্যাসোসিয়েশন প্রত্যেক বছর 6টা পায়রা দৌড় প্রতিযোগিতার আয়োজন করে থাকে। হাজারিবাগ থেকে কলকাতা, গয়া থেকে কলকাতা, মোগলসরাই থেকে কলকাতা, কানপুর—কলকাতা, এলাহবাদ—কলকাতা আর ডেহরি-অন-শোন - কলকাতা।

1955 সালে প্রথম গয়া থেকে কলকাতা 285 মাইলের এই দৌড় প্রতিযোগিতার আয়োজন করেন ক্যালকাটা রেসিং পিজিয়ন ক্লাব, তখন ক্লাবের সদস্য ছিলেন মোট 4 জন। চীনাদের মধ্যে এই পায়রা দৌড় জনপ্রিয় হয়েছিল। এর পাঁচ বছর পর দিল্লী ও কলকাতার মধ্যে পায়রা দৌড় প্রতিযোগিতা হয়েছিল। তারপর চীন-ভারত যুদ্ধের সময় এই ক্লাব ভেঙ্গে গিয়েছিল। 1978 সালে গঠিত হয় ক্যালকাটা রেসিং পিজিয়ন অ্যাসোসিয়েশন। এখন এর সদস্য সংখ্যা 30। এর মধ্যে অর্ধেক হলেন চীনা। ছোটবেলা থেকে দৌড়বীর পায়রাদের প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। তাদের পায়ে রিং পরিয়ে দেওয়া হয়। নাম, বংশপরিচয় খাতায় লিখে রাখা হয়। প্রথমে পাঁচ, দশ মিনিট, তারপর আরো বেশি এইভাবে তাদের ওড়ার তালিম দেওয়া হয়। ভোরবেলা আকাশে পায়রাদের উড়িয়ে দিয়ে তাদের মালিকরা দেখেন ঠিক মতো উড়ছে কিনা। প্রতি মিনিটে 1019 মিনিট গতিতে পায়রা উড়ে যাচ্ছে এমন দৃষ্টান্ত হ্যামেশাই মেলে। 1981 সালে এলাহবাদ-কলকাতার মধ্যে 814 কিলোমিটার প্রতিযোগিতায় যে 'বয় ব্লু' পায়রাটা দ্বিতীয় হয়েছিল, তারও গতি ছিল ঐরকম।

140, রামকৃষ্ণপুর লেন, হাওড়া-2

নিষ্ক্রিয় মৌল : হিলিয়াম

অমরনাথ রায়

গ্রীক শব্দ Helio মানে সূর্য। Helio থেকে 'হিলিয়াম' নামটির উৎপত্তি হয়েছে। 1868 সালে পূর্ণগ্রাস সূর্যগ্রহণ হয়। ঐ সময় ফরাসী জ্যোতির্বিদ পিয়ের জানসেন এবং ইংরেজ জ্যোতির্বিদ স্যার জোসেফ নরম্যান লকিয়ার সূর্যের উপরভাগের ক্রোমোস্ফিয়ার বাষ্পের বর্ণালী বিশ্লেষণ করেন এবং সেই বর্ণালীতে একটি অচেনা বর্ণরেখা লক্ষ্য করেন। এর আগে কোন চেনা মৌলের বর্ণালীতে অমন বর্ণরেখার সন্ধান মেলে নি। জ্যানসেন ও লকিয়ার তাই স্থির করলেন—অচেনা ঐ বর্ণরেখা নিশ্চয়ই কোন নতুন মৌল থেকে সৃষ্টি হয়েছে।

যেহেতু নতুন মৌলটির ধর্ম ও পরিচয় তখনও অজ্ঞাত এবং যেহেতু সূর্য দেহ থেকে আগত রশ্মির বর্ণালীতে নতুন বর্ণরেখাটির সন্ধান পাওয়া গেল, তাই সূর্যের গ্রীক নাম Helio থেকে নতুন মৌলটির নাম দিলেন তাঁরা 'হিলিয়াম'।

এরপর কেটে গেল আরও সাতাশটি বছর। 1895 সালে ইংরেজ রসায়নবিদ স্যার উইলিয়ম র‍্যামজে ইউরেনিয়াম-এর আকরিক 'ক্লেভাইট' থেকে উদ্ভূত একটি গ্যাসকে উত্তপ্ত করে তার থেকে নিঃসৃত আলোকরশ্মির বর্ণালীতে জ্যানসেন ও লকিয়ার-এর দেখা সেই অচেনা বর্ণরেখার সাক্ষাৎ পান। এতদিন পর্যন্ত যে মৌলের অস্তিত্ব কেবল সূর্যেই পাওয়া গিয়েছিল, র‍্যামজের পরীক্ষায় পার্থিব বস্তুতে এবার তার অস্তিত্ব ধরা পড়লো। এরপর ইউরেনিয়াম ও থোরিয়াম ধাতুর বিভিন্ন খনিজে, যেমন পিচব্লেণ্ড, কারনোটাইট, মোনাজাইট এবং বেরিল-এ হিলিয়ামের সন্ধান মিললো। উপরে যে সব খনিজের কথা বলা হয়েছে, সেগুলি সবই তেজস্ক্রিয় মৌলের খনিজ। ঐ সব খনিজে উপস্থিত তেজস্ক্রিয় মৌলের তেজস্ক্রিয়তার জন্যে হিলিয়াম সৃষ্টি হয়। তবে সৃষ্টি হয় খুবই অল্প পরিমাণে। এক কিলোগ্রাম ইউরেনিয়াম থেকে মাত্র 135 গ্রাম হিলিয়াম মেলে।

পৃথিবীতে হিলিয়ামের আরও অনুসন্ধান চললো। কোন কোন জায়গার খনিজ জলে (মিনারেল ওয়াটার), আগ্নেয়গিরি থেকে নিঃসৃত গ্যাসে এবং আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের কোন কোন অঞ্চলের প্রাকৃতিক গ্যাসে হিলিয়াম-এর অস্তিত্ব ধরা পড়লো। 'উটাহ' নামক জায়গায় আবিষ্কৃত হলো বিশ্ববিখ্যাত হিলিয়াম কূপ। আমাদের এই পশ্চিম বাংলার বক্রেশ্বরে যে উষ্ণ প্রস্রবণ আছে, তাতেও মিললো হিলিয়াম-এর সন্ধান। প্রতি দশ লক্ষ ভাগ বাতাসে ধরা পড়লো মাত্র পাঁচ ভাগ হিলিয়ামের অস্তিত্ব। বিজ্ঞানীরা আরও পরে পরীক্ষা চালিয়ে জানতে পারলেন যে, তেজস্ক্রিয় মৌল থেকে নিঃসৃত আলফাকণা তার তড়িৎ আধান হারিয়ে পরিণত হয় হিলিয়ামে। এ ভিন্ন লিথিয়াম ও বোরনের ওপর তীব্র গতিসম্পন্ন প্রোটন বা আলফা কণার আঘাতেও হিলিয়াম উৎপন্ন করা যায়।

নতুন এই মৌলটির সন্ধান পাওয়ার পর এর ধর্ম, প্রকৃতি ইত্যাদি নিরূপণে বিজ্ঞানীরা উঠে পড়ে লাগলেন। মৌলটির প্রতীক বা চিহ্ন নির্ধারিত হলো He হিসাবে, পরমাণু ক্রমাংক স্থির হলো 'দুই'। কাজেই মৌলের পর্যায়সারণীতে দু নম্বর মৌলরূপে চিহ্নিত হলো 'হিলিয়াম'। জানা গেল যে, ভূত্বকে 3×10^{-7} হিলিয়াম আছে। হিলিয়াম এক পরমাণুক মৌল এবং এর চারটি সমস্থানিক বা আইসোটোপ আছে। সেই চারটি সমস্থানিকের ভর সংখ্যা যথাক্রমে 3, 4, 5, এবং 6। ঐ সমস্থানিকগুলিকে বোঝানো হলো যথাক্রমে ^{3}He, ^{4}He, ^{5}He এবং ^{6}He চিহ্ন দ্বারা। আরও অনুসন্ধানের ফলে জানা গেল যে, প্রাকৃতিক হিলিয়াম সাধারণত ^{4}He দিয়ে গড়া। তবে 'তিন' ভর সংখ্যা বিশিষ্ট হিলিয়াম অর্থাৎ ^{3}He বায়ুমণ্ডলে অতি সামান্য পরিমাণে পাওয়া যায়। আর ^{5}He এবং ^{6}Heকে কৃত্রিম উপায়ে প্রস্তুত করা যায়।

বিজ্ঞানীদের অনুসন্ধানপর্ব এইখানেই কিন্তু থেমে গেল না। আরও পরীক্ষানিরীক্ষা চালিয়ে তাঁরা লক্ষ্য করলেন যে, হিলিয়াম বর্ণহীন, গন্ধহীন, নিষ্ক্রিয় গ্যাসীয় মৌল। পরিচিত সব পদার্থের মধ্যে হিলিয়ামের স্ফুটনাঙ্ক ও গলনাংক সবচেয়ে কম। আর দ্রাব্যতা? তাও কম। মাত্র 4·8 আয়তন হিলিয়াম 1000 ml. জলে দ্রাব্য। হিলিয়াম দাহ্য নয়, দহনের সহায়কও নয়। হাইড্রোজেন ছাড়া হিলিয়াম মাধ্যমে শব্দের গতিবেগ সবচেয়ে বেশি, তবে অন্য যে কোনও গ্যাসের চেয়ে হিলিয়ামের প্রতিসরণ সবচেয়ে কম। এ ভিন্ন হিলিয়াম লঘুভার মৌল। অবশ্য হাইড্রোজেন গ্যাস হিলিয়ামের চাইতে হাল্কা। হিলিয়াম লঘুভার মৌল বলে এবং তার পরমাণুগুলোর দ্রুত গতি থাকার জন্যে পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণ বল এই গ্যাসটিকে ধরে রাখতে পারে না। আবার নিষ্ক্রিয় মৌল হওয়ার দরুন কোন যৌগ সৃষ্টিও

করতে পারে না হিলিয়াম। এই সব কারণে ভূপৃষ্ঠে হিলিয়াম-এর পরিমাণ খুবই কম।

হাল্কা গ্যাস বলে বেলুনে হাইড্রোজেনের বদলে হিলিয়ামকে ব্যবহার করা যায়। হাইড্রোজেন দাহ্য গ্যাস, কিন্তু হিলিয়াম দাহ্য নয় বলে বেলুনে একে নির্ভয়ে ব্যবহার করা যায়। তাতে আগুন লাগা বা বিস্ফোরণ ঘটার কোনও সম্ভাবনা থাকে না। বেশি চাপে নিঃশ্বাসপ্রশ্বাসের কাজে অক্সিজেন ও হিলিয়ামের মিশ্রণ ব্যবহার করা হয়। এই এই মিশ্রণকে ফুসফুসের ভেতর টেনে নেওয়া ও আবার বের করে দেওয়া যায় খুব সহজ। হাঁপানির রুগী অথবা চেতনালোপ করার ওষুধ খেয়েছে এমন রুগীর শ্বাসকষ্ট উপস্থিত হলে তাকে হিলিয়াম ও অক্সিজেনের মিশ্রণ দেওয়া হয় শ্বাসকার্য চালাবার জন্যে।

1908 সালে ওনেস নামে এক বিজ্ঞানী হিলিয়ামকে তরলে পরিণত করতে সমর্থ হন। তারপর 1920 সালে লাইডেন (Leiden) এবং কেওসোম (Keosom) নামে দু'জন বিজ্ঞানী হিলিয়ামকে কঠিনে পরিণত করতে সমর্থ হন। তরল হিলিয়াম তৈরি করার পর তার কয়েকটা আশ্চর্য ধর্মের পরিচয় মেলে। 2·3 ডিগ্রী কেলভিন উষ্ণতায় হিলিয়ামের একটি অস্বাভাবিক ধর্ম প্রকাশ পায়। ঐ উষ্ণতায় তরল করা হিলিয়ামকে বলা হয় He-II বা হিলিয়াম 'দুই'। হিলিয়াম 'দুই'-এর সান্দ্রতা ধর্ম নেই বলে একে অতি তরল (সুপার ফ্লুইড) আখ্যা দেওয়া হয়। হিলিয়াম 'দুই' যে কোনও পরিচিত পদার্থের চেয়ে অনেক বেশি ক্ষিপ্রতার সঙ্গে তাপ পরিবহন করতে পারে। এর তাপ পরিবাহিতা তামার চেয়ে পঁচিশ গুণ বেশি। যে ক্ষুদ্র গর্তে বাতাস ঢুকতে পারে না, হিলিয়াম 'দুই' সেই গর্তের মধ্যে দিয়ে সহজেই পথ করে নিতে পারে। আবার একমুখ খোলা একটি নলকে হিলিয়াম 'দুই'-এর মধ্যে আংশিকভাবে ডুবিয়ে রাখলে দেখা যায় যে, ঐ তরলটি নলের গা বেয়ে উঠে নলের মধ্যে চলে আসে এবং কিছুক্ষণের মধ্যেই নলের ভেতরের ও বাইরের তল একই সমতলে এসে যায়। হিলিয়ামের অতি তারল্য (সুপার ফ্লুইডিটি) ধর্মের জন্যেই এমনটি ঘটে।

পর্যায় সারণীর মৌলদের মধ্যে দুনম্বর এবং নিষ্ক্রিয় ও সম্ভ্রান্ত মৌলদের মধ্যে এক নম্বর মৌল হিলিয়ামের এ মজার ধর্মের কথা তোমাদের ক'জনারই বা জানা আছে?

ইন্দা, খড়্গপুর, মেদিনীপুর।

সংখ্যা নিয়ে ভাবনা

দেবপ্রসন্ন সিংহ

খুব ছোটবেলায় কথা বলার কিছু পরেই তোমরা সংখ্যা গুণতে শুরু করেছ। প্রথমে এক থেকে দশ। পরে ক্রমান্বয়ে কুড়ি, পঞ্চাশ, একশ পর্যন্ত। বড়রা মাঝে মাঝে বলেছেন এক হাজার পর্যন্ত বসে বসে গোণ। সেটা ছিল প্রায় শাস্তি। বেশি দুষ্টুমি করলে এই শাস্তি ছিল। ধৈর্য ধরে বসে থাকতে হবে, তারপর মনে মনে বা জোরে গোণা। পড়াশোনার মধ্যে থেকে ধারাপাত নিয়ে, দুলে দুলে, সুর করে ছড়া কেটে নামতা মুখস্থ করেছ। একের নামতাটা সবাই মনে রেখেছে। কারণ তার সঙ্গে গুণে কেউ আরো বড় সংখ্যা পায় না। তারপর দুই, তিন করে দশ পর্যন্ত নামতা করেছ। তার ওপর এগার থেকে কুড়ি। এরপর অনেকে বড় নামতা মুখস্থ করেছ, অনেকে কর নি। কেউ কেউ বড় বড় গুণ নিমেষে করতে থাকেন, করার অভ্যাস করতে থাকেন। সোমেশচন্দ্র বসু, শকুন্তলা দেবী অনেক বড় বড় গুণ করেছেন। বছর পনেরো আগে একটি বিশ্ববিদ্যালয়ে শকুন্তলা দেবীকে প্রশ্ন করা হয়েছিল, $2^{64}-1$ কত? উনি নিমেষে একটি কুড়ি অংকবিশিষ্ট সংখ্যা লিখে দিলেন। দর্শকবৃন্দ থেকে একজন উঠে বললেন, এটা বোধহয় ঠিক না, একটা অংক লেখা আপনার বাদ পড়ে গেছে।' শকুন্তলা দেবী নিমেষে অংকটি আবার কষে ফেললেন এবং আমরা একই সঙ্গে দেখতে পেলাম—উনি বলছেন যে সংখ্যাটি ঠিকই লেখা হয়েছে। ঐ দর্শকবৃন্দ থেকে আর একজন উঠে এলেন। তিনি গাণিতিক প্রমাণ দিলেন, যে সংখ্যাটির লগারিদম নিলে জানা যাবে সংখ্যাটিতে কতগুলি সার্থক অংক (significant digit) আছে। এবং লগারিদম 2-এর মান প্রত্যেকের জানার ফলে সংখ্যাটি যে কুড়ি অংক বিশিষ্ট তা প্রমাণ হয়ে গেল [$64\times\log 2=64\times 0{\cdot}30103=19{\cdot}26592$ অর্থাৎ পূর্ণ সংখ্যার 1 বেশি হলে সার্থক অংকের সংখ্যা 20 হয়]। এইরকম অজস্র গুণ, কখনো দশ অংক, কখনো বা তারও বেশি দুটি সংখ্যাকে গুণ করেছেন নিমেষে। তের-অংক বিশিষ্ট একটি সংখ্যার সঙ্গে আর একটি তের-অংক বিশিষ্ট সংখ্যার গুণ করতে দেওয়া হয়েছিল শকুন্তলা দেবী ও ব্রিটেনের ইম্পিরিয়াল কলেজ অফ সায়েন্স অ্যাণ্ড টেকনোলজির কম্পিউটারটিকে। উদ্দেশ্য ছিল, কার কাছ থেকে আগে উত্তর পাওয়া যাবে? শকুন্তলা দেবী উত্তরটি দেন ত্রিশ সেকেণ্ডে, কম্পিউটার দেয় তেষট্টি সেকেণ্ডে। অবশ্য এ প্রসঙ্গে উল্লেখ্য যে, কম্পিউটারের দায়িত্ব শুধু দুটি অংকের গুণেই সীমাবদ্ধ থাকে না, আরো বড় গুণ আরো শতবার করাতেও তার নিমেষে করতে ক্লান্তি নেই। কিন্তু কাজ চালানো বড় গুণ করতেও এখন খাতা পেন্সিলের দরকার পড়ে না। ক্যালকুলেটর আসার ফলে ভারাক্রান্ত গুণের, যোগের ব্যবহার কমেছে।

তোমরা ইতিমধ্যেই নিশ্চয়ই ক্যালকুলেটরের নাম শুনেছ, ছবি দেখেছ, অনেকে চোখেও দেখেছ। বিদেশে তো বটেই, এদেশেও অনেক রকম ক্যালকুলেটর তৈরি হয়েছে। কোনটায় কম প্রক্রিয়া আছে, কোনটায় বেশি। কোথাও সংখ্যা ধরে রাখার ক্ষমতা আছে। কোথাও শুধু অংকটি দেখা যায়, কোথাও লাগানো কাগজে উত্তর বেরয়। কোনটাতে গান বাজানো যায়, বেশ কয়েকটি সুরে। অনেক বড় বড় অফিসে, দোকানে, মূলতঃ হিসেব রাখার জায়গায় ক্যালকুলেটরের ব্যবহার দেখা যাচ্ছে। অনেক বাড়িতেও দেখবে ক্যালকুলেটর দ্রষ্টব্য হিসেবে এসেছে। বড় বড় যোগ, গুণ, বিশাল বিশাল সংখ্যা নিয়ে ক্যালকুলেটর বা ঐ ধরনের যন্ত্র ব্যবহার হচ্ছে। ঠিকভাবে প্রক্রিয়ার কাজটি করার জন্যে। শুধু ঠিকভাবে আঙুলটা ঠিক বোতামে টিপতে হবে। ঠিক সংখ্যায়, ঠিক প্রক্রিয়ার নির্দিষ্ট বোতামে। এটা ঠিক হলেই যোগটা নির্ভুল হবে। যোগের জন্য বাড়তি খাটতে হবে না। কিন্তু আঙুলটা ভুল বোতামে পড়লে ক্যালকুলেটর ভুল উত্তর দেবে। আমার মনে আছে, বেশ কয়েক বছর আগে রেশন দোকানের মালিকের ভাই কাউণ্টারে বসতেন আর জিনিস পত্র নেওয়ার আগে দাম দেবার সময় ক্যাশমেমোতে যোগ করতেন, পাঁচে তিন আট, পাঁচে তিনে আট, তার হাতের পেনসিল পাঁচ আর তিন এই দুটি সংখ্যাতে ছ-সাত বার লাফালাফি করে এসে স্থির হত যোগ সংখ্যা আটে। তাও অন্য এক জায়গায় সেটি লিখতেন। কারণ আরো অনেক যোগ আটের সঙ্গে করতে হত। ক্যালকুলেটর রেশন দোকানে ব্যবহার করার মত সংগতি এখন নয়, কিন্তু ঐ পাঁচ আর তিনের মত দুটি নিরীহ সংখ্যাকে অতবার যোগ করাটা কি বিরক্তিকর ও সময় নষ্ট-করা ব্যাপার!

কিন্তু তা বলে কি, পাঁচের সঙ্গে তিন যোগ অথবা তিনের সঙ্গে চারের গুণ করতে কি ক্যালকুলেটর ব্যবহার করতে হবে? এই সহজ নামতা ভুলে, ক্যালকুলেটরের কাছে গেলে, সে ব্যাটারি খুইয়ে বসলে এ গুণ সহজে মাথা

থেকে নামবে না। গুণটুন ভুলে, সব গুণেই ক্যালকুলেটরের দ্বারস্থ হলে, পরে কি অবস্থা হয় তা নিয়ে একটা সত্য ঘটনা বলি। আমার এক বন্ধু আমেরিকা গিয়েছিল কর্ম-সূত্রে। সেখানে বিশ্বের নানা দেশের ছাত্রছাত্রীরা পড়তে আসে, শিক্ষণপ্রাপ্ত হয়। একদিন ক্লাশে একটি অংক করার সময় আমার বন্ধুর এক বিদেশী বন্ধু অভ্যাসবশত তার প্যান্টের পিছনের পকেটে ক্যালকুলেটরের জন্যে হাত বাড়াল। দেখল সেটি ভুলে ঘরে ফেলে এসেছে। অতঃপর আমার বন্ধুটিকে বলল, 'বন্ধু, কি উপায়?' আমার বন্ধুটি বলল, এ আর এমন কি শক্ত, 4·8 কে 5 দিয়ে গুণ করলে 24 হবে। বিদেশী বন্ধুটি বলল, আশ্চর্য। তুমি কত তাড়াতাড়ি করলে। এত তাড়াতাড়ি তোমরা ভারতীয়রা কি করে কর? আমার বন্ধুটি বলল, নাঃ, এতো সোজা, 48কে দশ দিয়ে গুণ কর, তারপর দুই দিয়ে ভাগ কর, যেহেতু 5 দিয়ে গুণ হচ্ছে। বিদেশী বন্ধুর অংক কষার পদ্ধতি শুনে চোখ দুটি ছানাবড়া।

তোমরা নিশ্চয়ই জানো, 5,25,50 দিয়ে গুণ করতে গেলে খুব সহজেই দশের গুণে সেটা ফেলে তাড়াতাড়ি করা যায়। কেউ যদি 32কে 25 দিয়ে গুণ করতে বলে, 32কে 100 দিয়ে গুণ করে 4 দিয়ে ভাগ করলে ঠিক উত্তর 800 পাওয়া যাবে। সেইরকম 3·2 আর 2·5 এর গুণফলে দশমিক বিন্দু দুটি সংখ্যা পিছিয়ে যাবে। সংখ্যাটি হবে আট।

গুণ মনে রাখার অনেক উপায় আছে। যেমন এগারকে ক্রমান্বয়ে গুণ করলে তা পেতে গুণ করার প্রয়োজন নেই। $11\times11=121$, $11\times11\times11=12321$, $11\times11\times11\times11=1234321$ অর্থাৎ যতবার গুণ হচ্ছে, গুণ-ফলে 1 থেকে পর পর লিখে যেতে হবে সেই সংখ্যাটি পর্যন্ত, তারপর আবার এক করে কমিয়ে এক পর্যন্ত যেতে হবে। সেইরকম 11 কে 9 বার গুণ করলে হবে 12345 678987654321। সংখ্যার শেষে 5 থাকলে, কতকগুলি গুণে সুবিধে হয়। শেষে 5 অংক কোন সংখ্যার বর্গ করলে, শেষে 25 হবেই, আর আগের যে সংখ্যাটি আছে, তার সঙ্গে পরের সংখ্যা গুণ করে গুণফলে 25এর আগে বসাতে হবে। যেমন, 25×25 এর গুণফলে শেষে 25, আগে হবে $2\times(2+1)=2\times3=6$ অর্থাৎ 625। সেই রকম $42\times45=2025$, $65\times65=4225$, $95\times95=9025$। পরপর দুটি 5 শেষ অংকবিশিষ্ট সংখ্যা গুণেরও একটা ধরন পাওয়া যায়। অর্থাৎ 15×25 বা 25×35 বা 55×65 বা 85×95এর গুণ ফলে। এইখানে শেষ দুটি সংখ্যা 75 হবেই। আর প্রথমে বড় সংখ্যাটির সঙ্গে এক যোগ করে; ছোট সংখ্যাটির সঙ্গে গুণ করতে হবে। অর্থাৎ 15×25 গুণফলে শেষে 75 হবে। আগে 1×2র জন্যে ছোট সংখ্যা 1 বড় সংখ্যা 2র সঙ্গে 1 যোগ করলে 3 হয়, $1\times3=3$ অর্থাৎ গুণফল 375। সেইরকম 45×55 হবে 2475, কারণ শেষে 75 ও ছোট সংখ্যা $4\times($বড় সংখ্যা $5+1)=4\times6=24$ হচ্ছে।

73-B একডালিয়া রোড, কলি-19

ক্যালেণ্ডার ঘড়ি

উত্তমকুমার দাস

"ক্যালেণ্ডার ঘড়ি" এখন পৃথিবীতে হাজির। কথাটা শুনে প্রথমে বিস্মিত না হয়ে তোমরা হয়ত ঠোঁট উলটে বলবে, সে তো অনেকদিন। কিন্তু আমার প্রশ্ন, তোমরা যে ঘড়ির কথা ভাবছ, তাকে কি ঠিক ক্যালেণ্ডার ঘড়ি বলা উচিৎ? ওতে তো শুধু "বর" আর "তারিখ" দেওয়া থাকে। কিন্তু আমি যে ঘড়ির কথা বলছি, তাকে তাকে "ক্যালেণ্ডার ঘড়ি" বলা যায়। কেননা, তাতে দেওয়া আছে, "মাস," "সপ্তাহ" "বার" ও বিশেষ বিশেষ "উৎসবের" দিনগুলি। আর ঘণ্টা মিনিট তো আছেই।

এবার নিশ্চয় ভাবছ, সত্যিইতো এসব না থাকলে ক্যালেণ্ডার হয় না। সেই সঙ্গে ভাবছ, কিন্তু কই, এমন ঘড়ি তো দেখিনি। তবে শোনো, এমন ঘড়ি আছে রাশিয়ার রিয়াজানবাসী ভাসিলি মিখাইলভের কাছে। তিনি নিজেই এই ঘড়ি তৈরি করেছেন, নিজের নকশা অনুযায়ী এবং স্প্রিং বাদে নিজস্ব ডিজাইনে সব যন্ত্রাংশ তৈরি করে। যা নিজস্ব বিশেষ যন্ত্রপাতি দিয়েই তৈরি। এই ঘড়িটি তৈরি করতে তাঁর সময় লেগেছিল চার বছর। এটি ছাড়াও ভাসিলি মিখাইলভের কাছে আছে সব মিলিয়ে আরও ৬০টিরও বেশি ঘড়ি।

52, মাণিকতলা মেন রোড, কলিকাতা-54

ধারাবাহিক উপন্যাস

আগে যা ঘটেছে

রহস্যময়ভাবে মফস্বল শহরের একটি ব্যাঙ্কে ডাকাতি হয়ে গেল। যে ব্যাঙ্কে সদ্য ম্যানেজারের চাকরী নিয়ে এসেছে সুশান্ত। কোন রাসায়নিক দ্রব্য ব্যবহার না করে, ব্যাঙ্কের তালা না ভেঙে স্ট্রংরুম থেকে ডাকাতি হয়ে গেল বহু টাকা। স্ট্রংরুমের তালা খুলতে হলে তো দুটো চাবির প্রয়োজন হয়—যার একটা থাকে ব্যাঙ্কের ক্যাশিয়ারের কাছে, আর একটা সুশান্তর নিজের কাছে। তা হ'লে ডাকাতেরা তালা খুলল কি করে? একটু পরেই এল পুলিশ। সকলের জবানবন্দী নেওয়া হল। কলকাতা থেকে ব্যাঙ্কের ম্যানেজার ও একজন ডিরেক্টর এলেন। ব্যাঙ্কের সব কর্মচারীই দোষ চাপাল সুশান্তর উপরে। সুশান্ত ভীষণ ভেঙে পড়ল। অবশেষে তার বাবার বন্ধু সতীনাথ বাবুকে কলকাতায় চিঠি দিয়ে ডেকে পাঠাল। সতীনাথ বাবু—ডিটেক্‌টিভই শুধু নন, বড় বৈজ্ঞানিক। ব্যাঙ্ক সুশান্তকে সাসপেণ্ড করল। এর মধ্যেই কলকাতা থেকে এলেন নতুন ব্যাঙ্ক ম্যানেজার মিঃ কে. সি. ত্রিবেদী।

সতীনাথবাবু হঠাৎই এসে সুশান্তকে যে জিনিস দেখালেন, তাতে সুশান্তর চিন্তা আরও বেড়ে গেছে। স্ট্রংরুমের আলমারীতে যে ছাপ পাওয়া গেছে, তা মানুষের হাতের ছাপ নয়—বানর জাতীয় কোন প্রাণীর।

সতীনাথ বাবু পুলিশের বড়কর্তার কাছে এসে তাঁকে ছোট্ট একটা জিনিসের ফিঙ্গার প্রিণ্ট করে দিতে বললেন। ফিঙ্গার প্রিণ্টটা কিছুটা নতুন খবর এনে দিয়েছে। কলকাতা থেকে সতীনাথ বাবু ফিরলেন পুলিশের এস পি এবং ব্যাঙ্কের ডিরেক্টর মিঃ সেনকে সঙ্গে নিয়ে। সুশান্ত ব্যাপারটা কিছুই বুঝতে পারল না। এস পি জানালেন সত্যিকার অপরাধীরা ধরা পড়েছে এবং শেষ পর্যন্ত স্বীকারও করেছে। তিনজন অপরাধীর মধ্যে একজন ব্যাঙ্কের ক্যাশিয়ার, দ্বিতীয় থানার ছোটকর্তা, আর তৃতীয় নতুন ম্যানেজার মিঃ ত্রিবেদী। সরযূপ্রসাদই যে মিঃ ত্রিবেদী একথা শুনে সুশান্ত বিস্ময়ে অবাক হয়ে যায় এবং চমৎকৃত হয়ে পড়ে ব্যাঙ্ক ডাকাতির দুর্ধর্ষ পরিকল্পনা শুনে। আলমারির গায়ে যে ছাপ পাওয়া গেছে—সেগুলি মানুষের নয়। বাঁদুরে আঙুলের ছাপ কৃত্রিম উপায়ে তৈরী করে ব্যবহার করা হয়েছে।

॥ উনিশ ॥

সতীনাথ বাবু আবার বলতে লাগলেন ঃ

"বানরের বা বনমানুষের মত ঐ অঙ্গুলের ছাপ যে সত্যিকার বানর বা বনমানুষের নয় তা প্রমাণিত হবার পর স্বভাবতঃই আমার মনে প্রশ্ন জাগল কে এই লোকটি হতে পারে যে ঐ বাঁদুরে অঙ্গুলের দস্তানা পরে ব্যাঙ্ক ডাকাতি করতে এসেছিল। নিশ্চয় কোন কাছে পিঠের কোন লোক যে ব্যাঙ্কের নাড়ীনক্ষত্র জানে। ক্যাশিয়ার বৈজুনাথের চাবি হারানো সত্ত্বেও অমন নির্লিপ্ত ভাব দেখে সে যে সাক্ষাৎ বা পরোক্ষ ভাবে এ ব্যাপারের সঙ্গে জড়িত তা অনুমান করে নিয়েছিলাম। নইলে অমন একটা মূল্যবান চাবি হারাবার পর সঙ্গে সঙ্গে অফিসের বড়কর্তাকে অর্থাৎ তোমাকে না জানানোর কোন মানে হয় না। ব্যাঙ্কে স্ট্রাইক চলছে, তোমার কাছে গিয়ে কথা বললে সহকর্মীরা ওর প্রতি বিরূপ হবে, এ যুক্তি এমন একটা গুরুতর ব্যাপারে কোন যুক্তিই নয়। শুধু থানায় বাক্স চুরির একটা ডায়েরী করে নিয়ে এসে—তাও সে বাক্সে যে অমন একটা মূল্যবান চাবি ছিল সে কথারও উল্লেখ না করে অমন নির্বিকার ভাবে বসে থাকা অসম্ভব। মনোবিজ্ঞানীরা জানেন, সত্যি এমন একটা ব্যাপার ঘটলে মনের মধ্যে যে অশান্তি—দুর্ভাবনা ইংরেজিতে যাকে বলে টেনশন, চলতে থাকে তা গোপন করা সহজ নয়। নিশ্চয়ই ঐ চাবি সমেত ব্যাঙ্ক-চুরির ঘটনাটা সত্যি নয়, কিংবা ওই চাবি তিনি কোথাও পাচার করে দিয়েছেন এবং এ ব্যাপারে কোন মহল থেকে এমন আশ্বাস পেয়েছেন যে তাঁরা তাঁকে রক্ষা করবেন, হয়তো বা ব্যাঙ্ক লুঠ করতে পারলে কিছু ভাগও দেবেন। কিন্তু এমন লোক কে আছে যে ওঁকে ও-রকম আশ্বাস দিতে পারে?

"এ ব্যাপারটা ভেবে ভেবে আমি নিজেই বেশ চিন্তায় পড়েছিলাম, কোন সূত্র খুঁজে পাচ্ছিলাম না। কিন্তু আমার দৃঢ় বিশ্বাস ছিল শিগগিরই কোন না কোন দিক্ থেকে ঐ সূত্র আপনিই ধরা দেবে।

"শেষ পর্যন্ত ধরা দিয়েছেও। পুলিশের বড়কর্তা নিজেকে কবি বলে জাহির করতে ভালোবাসেন। যাঁরা কবিতা লিখতে গিয়ে তেমন পাত্তা পান না, তাঁদের কেউ খাতির করে কবিত্বের সম্মান দিলে খুশি হন—এ দুর্বলতার কথা কে না জানে? আমি সেটার সুযোগ নিয়ে বড়-কর্তার সঙ্গে দহরম মহরম শুরু করলাম। দেখলাম, ও-সব দুর্বলতা থাকলেও লোকটি সৎ এবং কর্মদক্ষ। কোন ভড়ং নেই, কিন্তু আমার যে সব তথ্য দরকার তা অতি নিপুণ ভাবে সংগ্রহ করে দিয়েছেন, কিন্তু ছোটকর্তার সম্বন্ধে সে রকম ধারণা করতে পারি নি, আগেই বলেছি, তাঁর কর্ম-

ব্যস্ততার যতটা ভড়ং আছে ততটা কাজের কাজ দেখতে পাই নি। আমার প্রয়োজনীয় কোন তথ্যই তিনি দিতে পারেন নি—দেন নি। কারণটা অবশ্য পরে বুঝলাম। যাই হোক, তিনি বরাবর তোমাকেই ষড়যন্ত্রের নায়ক বলে আমাকে বোঝাবার চেষ্টা করে আসছিলেন' যাতে আমি ধাঁধায় পড়ে অন্য সূত্র খুঁজবার চেষ্টা না করে তোমার দিকেই দৃষ্টিটা বেশি রাখি। লোকটা বেশ চালাক, অভিজ্ঞ গোয়েন্দাকে যে ওভাবে ভাঁওতা দেওয়া যায় না সে ধারণাই ওঁর ছিল না। কিন্তু শেষ মুহূর্তে উনিও ধরা দিতে বাধ্য হলেন। ত্রিবেদীর সঙ্গে ওঁর যে অত দহরম-মহরম হঠাৎ একদিন তা আমার কাছে ফাঁস হয়ে গেল যেদিন ছদ্মবেশে বি. সি. পাণ্ডে সেজে ত্রিবেদীর বসতবাড়িতে গিয়ে আমি হানা দিলাম লণ্ডন থেকে সরযূপ্রসাদের দেওয়া প্যাকেট পৌঁছে দেবার আছিলায়। আসলে প্যাকেটট্যাকেট কিছুই আমার সঙ্গে ছিল না—সবটাই বানানো গল্প তা তো বুঝছ। সরযূপ্রসাদের পাঠানো পার্সেল শুনে ত্রিবেদীর কি প্রতিক্রিয়া হয় তাই জানতে গিয়েছিলাম। আর সেইখানেই আশ্চর্য্য হয়ে দেখলাম, পোষাক বদলে পুলিশের ছোটকর্তা বসে বসে একটা ম্যাগাজিনের ছবি দেখছেন।

"প্রতিক্রিয়া দেখলাম' দু'জনের মধ্যেই। আমার পুনরাবির্ভাব বানচাল করার জন্য ওঁদের,—বিশেষ করে ছোটকর্তার সাফাই দেখে অবাক লাগল আর সেই সঙ্গে নতুন একটা সূত্র মাথা চাড়া দিয়ে উঠল। বুঝলাম এবার খুব চটপট কাজ করতে হবে।

"ভালো কথা তোমার মনে আছে বড়কর্তার কাছে আমি দ্বিতীয় একটা আঙুলের ছাপের ফটো তৈরী করতে দিয়ে ছিলাম এবং খুব জরুরী বলে একদিনেই করিয়ে নিয়েছিলাম। কোথায় পেলাম ছাপ?

"সরযূপ্রসাদের সাজানো গোছানো বাড়ির ভেতরটা দেখবার সুযোগ ঐ বোকা চাকরটাই আমাদের করে দিয়েছিল। ওপরে গিয়ে ইচ্ছে করেই হাতে ময়লা লাগিয়ে আমি ওদের বাথরুমের বেসিনে হাত ধুতে গিয়েছিলাম তোমার নিশ্চয়ই মনে আছে, আর বাথরুমে গিয়ে তো লোকে অভ্যাশবশতঃই দরজা ভিতর থেকে বন্ধ করে দেয় আমিও তাই দিয়েছিলাম, চাকরটি কোন সন্দেহই করে নি। বাথরুমে ঢুকেই আমি দেখলাম দেয়ালের আলিনায় একটা পরিস্কার তোয়ালে ঝুলছে। আমার পকেটে একটা শক্তিশালী লেন্স সর্বদাই থাকে, সেটা দিয়ে তোয়ালের ওপর ধরতেই তোয়ালের এক কোণে একটা আঙুলের ছাপের মত লক্ষ্য করা গেল। কার ওট? সরযূপ্রসাদ চলে যাবার পর আর কেউ নিশ্চই এই বাথরুমে ঢোকে নি চাকরটার উপর নির্দেশ আছে সবকিছু টিপটপ সাজিয়ে রাখতে হবে। ও-ও তাই ও তোয়ালেতে হাত দেয় নি, যেমন আলনায় ঝুলছিল তেমনি রয়ে গেছে। তাহলে এ আঙুলের ছাপ নিশ্চয়ই সরযূপ্রসাদের।

এই অভাবিত আবিষ্কার আমার কাজ নিমেষে অনেকখানি এগিয়ে দিল। অতি সাবধানে তোয়ালের সেই কোনটা কেটে নিয়ে এলাম আমি। থানার বড়োকর্তা যখন ঐ ছাপের ফটো আমাকে নিলেন তখন অবাক হয়ে দেখলাম ব্যাঙ্ক ডাকাতিতে যে রকম বাঁদুরে আঙুলের ছাপ পাওয়া গিয়েছিল এটিও অবিকল সেই ছাপ। সেইরকম অসতর্ক ভাবে তৈরী বাঁদুরে আঙুল লাগলো দস্তানা দিয়ে তোয়ালেটা ধরা হয়েছিল. বোধ হয় ব্যাঙ্ক অভিযানের ঠিক আগে। তা হলে দস্তানাধারী আর কেউ নয় তোমার স্বয়ং অন্তরঙ্গ বন্ধু, অবশ্য তোমার ধারণায়, সেই সরযূপ্রসাদ।

"সমস্ত ব্যাপারটা যেন জলের মত স্পষ্ট হয়ে আসতে লাগল। বাড়ি ফিরে আরও শক্তিশালী লেন্স দিয়ে প্রথম ও দ্বিতীয় দু'টি ছাপ পাশাপাশি রেখে পরীক্ষা করে আমার অনুমান যে নির্ভুল তা আর একবার যাচাই করে নিলাম।

"তাহলে কি কি সূত্র পাচ্ছি? ব্যাঙ্ক ডাকাতির আসল নায়ক সরযূপ্রসাদ, ডাকাতি করেই সেই মুহূর্তেই যে হাওয়া হয়ে গেছে—বিদেশে গিয়ে প্ল্যাস্টিক সার্জারি করে নিজের মুখের চেহারা আমূল বদলে ফেলতে। কাজ হাসিল করে অল্প কিছু দিন পরে মুখের অস্ত্রোপচারের এবং গ্র্যাফ্‌টিং-এর চিহ্ন যখন মিলিয়ে গেল তখনই সে ফিরে এল নতুন চেহারা আর নতুন নাম নিয়ে। ডাকাতি করার আগে সে নিশ্চিত নিরাপত্তার জন্য এমন দু'জন সঙ্গী বেছে নিয়েছিল যাদের একজন তাকে স্ট্রং রুমের চাবি দিয়ে সাহায্য করতে পারে এবং আর এমন আর একজন লোক যে তাদের সমস্ত কুকীর্তি আড়াল করে রাখতে পারে। প্রথম জন ব্যাঙ্কের ক্যাশিয়ার বৈজুনাথ, আর দ্বিতীয় জন খোদ থানার ছোট কর্তা। অবশ্য জানি না এজন্য ঐ সাগরেদদের লুটের কত ভাগ দেওয়া হয়েছিল। বৈজুনাথকে প্রলুব্ধ করতে হয়তো কোন অসুবিধা হয়নি, কারণ ছোট কর্তাই তাকে আশ্বাস দিয়েছিলেন যে তিনি তাকে আড়াল থেকে রক্ষা করবেন। হয়তো তাঁরই পরামর্শে বৈজুনাথ ঘটনার দিন দুই আগে থানায় একটা মিথ্যা ডায়েরি করে রেখেছিল—বাক্স চুরির এবং ছোটকর্তা নিজেই সেটা তদন্ত করার ভার নিয়ে চাপা দিয়ে রেখেছিলেন। ব্যাঙ্ক ডাকাতির পরই খবর

পেয়ে থানার বড়কর্তা ছোটকর্তা দু'জনকেই নিয়ম মাফিক ব্যাঙ্কে যেতে হয়েছিল এবং এক্ষেত্রে পুলিশের দিক্‌ থেকে যে সব নিয়মকানুন মেনে চলতে হয় তা না মেনে উপায় ছিল না। কিন্তু ছোটকর্তা, যখনই সম্ভব হয়েছে, বড়-কর্তাকে রেহাই দিয়ে নিজে আগে বাড়িয়ে দায়িত্ব নিয়েছেন তিনি যে খুব কাজ-পাগল তার প্রমাণ দিতে। আসলে যে সেটাও ভাঁওতা এবং তার উদ্দেশ্যে তদন্তের সূত্রগুলো এলোমেলো করে দেওয়া এ বুঝতে এখন কষ্ট হয় না। বড়কর্তা, আগেই বলেছি, সৎলোক। তিনি তাঁর দায়িত্ব এড়াবার চেষ্টা করেন নি, এবং যখনই দরকার বোধ করে-ছেন নিজের কর্তব্য নিজে করেছেন। অবশ্য কর্তব্য হিসেবেই হয়তো করেছেন, নইলে ছোটকর্তার মতলব সম্বন্ধে তাঁর কিছু জানার কথা নয়।

"এর পরবর্তী সূত্র হচ্ছে মিস্টার ত্রিবেদীর আচরণ। বাঙ্গালী না হয়েও তিনি যে বাঙালী সেটা জাহির করার চেষ্টা, অনাবশ্যক তোমার সঙ্গে মাখামাখির চেষ্টা—তুমি যে ওঁকে চিনতে তো পারোই নি, সন্দেহও করোনি সে বিষয়ে নিশ্চিত হওয়া, তোমাকে এবং হয়তো সেই সঙ্গে আমাকেও কিছুটা চোখে চোখে রাখার চেষ্টা—যদিও আমার বিভিন্ন ছদ্মবেশে আমাকে চিনে ফেলা ওঁর পক্ষে সম্ভব হয় নি। আরও কিছুটা আগে। সরযূপ্রসাদকে উনি চেনেন না কিন্তু সরযূপ্রসাদ সম্বন্ধে ওঁর অহেতুক আগ্রহ। সেটা যে তাঁর রূপ পরিবর্তন সম্বন্ধে স্থিরনিশ্চয় হবার একটা চেষ্টা তা তো বোঝাই যায়। অথচ সরযূপ্রসাদের চাকরের সঙ্গে ওঁকে একত্র দেখেছি। জানি না চাকরটা ওঁর আসল পরিচয় জানত কিনা। নিশ্চয়ই জানত না, তা হলে ওভাবে আমাদের ঘর খুলে ওপরে যেতে দিও না। সম্ভবতঃ নিজের মনের দ্বন্দ্ব এড়াবার জন্যই ত্রিবেদী চাকরটির সঙ্গে নিজেই গিয়ে আলাপ পরিচয় করে নিয়েছিলেন-ওর মারফৎ নানা ব্যাপারে খোঁজখবর নেবার সুবিধে হবে বলে।"

"কিন্তু কাকা, আমার চাবিটা এত সাবধানে রাখা সত্ত্বেও হারিয়ে গেলে কি করে আর ওদের হাতেই বা পড়ল কি করে?"

সতীনাথবাবু আবার তাঁর স্বভাবসুলভ হাসি হেসে বললেন, "এঃ, এতক্ষণ বাদে এই প্রশ্ন? গোড়াতেই তো তোমার অনুমান করে নেওয়া উচিত ছিল। সরযূপ্রসাদের সঙ্গে অত মাখামাখির গল্প আমাকে শোনালে কিন্তু তার মধ্যে এমন কোন ঘটনার কথা তোমার মনে পড়ল না যাতে চাবিটা ওর হাতে চলে আসতে পারে? আমি কিন্তু প্রায় সঙ্গে সঙ্গে ওটা আঁচ করতে পেরেছিলাম এবং সে অনুমান যে নির্ভুল নয় এস্‌. পি. বাজপেয়ী সাহেবের জেরার মুখে ওকে তা স্বীকার করতে হয়েছে।

"কি রকম!"—অবাক্‌ চোখে সুশান্ত প্রশ্ন করল।

'কি রকম'—অবাক চোখে সুশান্ত প্রশ্ন করল

"তোমার মনে পড়ছে না? তুমিই তো গল্প করে-ছিলে। যেদিন রাত্তিরে ব্যাঙ্ক ডাকাতি হ'ল সেদিন সন্ধ্যাবেলা সরযূপ্রসাদ তোমার বাড়িতে এসেছিল। তোমাকে নিয়ে শহরে বেশ হৈ চৈ চলছে এই খবর দিয়ে তোমাকে সাবধান করে দিয়ে ছিল স্ট্রংরুমের চাবিটা যেন খুব সাবধানে রাখা হয়। উত্তরে তুমি বলেছিলে, তাই তুমি রেখেছ; এমন জায়গায় যেখান থেকে কারো পক্ষে তা তুলে নেওয়া সম্ভব নয়। তার পর ওকে বিশ্বাস করে এমন কথাও বলেছিলে যে আসল চাবিটি তুমি সর্বদা তোমার পৈতের সঙ্গে বেঁধে রাখ আর, যে হেতু, মাতৃভক্ত তুমি, মায়ের আদেশে সর্বক্ষণ পৈতে পরে থাক, যা আধুনিক বামুনের ছেলেরা অনেকেই করে না। এর পর সরযূপ্রসাদ তোমাকে তারিফ করে এই খুব ভালো ব্যবস্থা বলে উঠতে যাচ্ছিল, কারণ চাবি রাখার জায়গায় হদিস সে পেয়ে গেছে আর ঠিক সেই সময় যে চাবি হাতিয়ে নেবার একটা সুবিধে তুমি নিজের করে দিলে, হঠাৎ

তোমার পিঠটা চুলকোতে শুরু করায় তুমি গায়ের জামাটা খুলে টেবিলের ওপর রেখে খালি গায়ে একটা তোয়ালে নিয়ে বাথরুমে চলে গেলে পিঠটা একটু ভিজে তোয়ালে দিয়ে ঘসবার জন্য। ঐ সময়ে জামার সঙ্গে, হয়তো ঘামের জন্যই হবে পৈতেটাও তো আটকে রইল তাড়া-তাড়িতে তা আর তুমি খেয়াল করলে না। কিন্তু সরযূ-প্রসাদ তা লক্ষ করেছিল। তাই চকিতে—বিদ্যুৎবেগে কিন্তু সে চাবিটা পৈতে থেকে খুলে নিয়ে ভালো মানষের মত বসে রইল। তুমি এসে, পিঠে চাকা চাকা দাগ হয়ে গেছে বুঝতে পেরে ওকে একটা অ্যান্টিসেপ্‌টিক মলম লাগিয়ে দিতে বললে, ও-ও তাই দিল। তারপর তুমি একটু আরাম পেয়ে ফের জামাটা পৈতে সমেত গায়ে দিয়ে নিলে। তুমিই আমাকে বলেছিলে যে চাবিটা খুব হাল্কা কিন্তু অসম্ভব মজবুত। রাত দিন প'রে থাকলে ওর অস্তিত্ব সম্বন্ধে খেয়াল থাকে না। যারা রাতদিন চশমা পরে থাকে তারা সব সময় ওর অস্তিত্বে টের পায় না—অভ্যাস এমনই জিনিস। কিন্তু যারা নতুন চশমা নেয় তারা কিছুদিন কি অস্বস্তিই না অনুভব করে—নাকে কানে একটা বিজাতীয় জিনিস সর্বক্ষণ চেপে বসায়! আর চাবি তো সে তুলনায় কিছুই না। কাজেই পৈতের মধ্যে যে চাবিটা যে আর বাঁধা নেই সেটা তুমি টেরও পেলে না। এমন কি পর দিন জরুরি তার পেয়ে হেড অফিস থেকে ব্যাঙ্কের জেনারেল ম্যানেজার এসে যখন তোমার কাছে চাবি চাইল তখন পর্যন্ত তোমার খেয়াল নেই যে চাবিটা পৈতের সঙ্গে বাঁধা নেই। হয়তো ঐ অসম্ভব ঘটনার অর্থাৎ ব্যাঙ্ক ডাকাতির ফলে তোমার মন এত বিচলিত ছিল যে ও-সব তুচ্ছ ব্যাপারের কথা তুমি একদম ভুলে গিয়েছিলে, যাই হোক, বৈজুনাথকে হাত করে তার চাবি এবং তোমার অলক্ষ্যে তোমার পৈতে থেকে খুলে নেওয়া অপর চাবি দু'টোই সরযুপ্রসাদরা পেয়ে গেল আর সঙ্গে গভীর রাতে গিয়ে স্ট্রংরুমের তালা খুলে—ভেঙ্গে নয় কিন্তু—বাণ্ডিল বাণ্ডিল টাকা নিয়ে সরে পড়ল। সম্ভবতঃ তিন মহাপ্রভুই এক সঙ্গে এ কাজে হাত লাগিয়েছিলেন তাই চট্ পট্ কার্যোদ্ধার করা সম্ভব হয়েছিল। ব্যাঙ্কের দরওয়ান এবং পাহারাদারেরা যে ঐ সময়ে সিদ্ধি খেয়ে একটু ঢোলক সহযোগে সঙ্গীত চর্চা করে এ খবর ওঁদের জানা ছিল, আর ঐ শব্দের আড়ালে স্ট্রংরুম লুট করার সময় যদি কোন আওয়াজ হয়ও তা-যে চাপা পড়ে যাবে এ বিষয়েও ওঁদের সন্দেহ ছিল না। বেশ সহজ ভাবেই ওঁরা কার্যোদ্ধার করে ছিলেন।"

সুশান্তর মুখ দিয়ে আর কথা বেরুল না, সে বোকার মত ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে রইল।

॥ কুড়ি ॥

তাকে একটু সামলে নেবার সময় দেবার জন্য সতীনাথ বাবু একটুক্ষণ চুপ করে রইলেন, তার পর ফের বলতে শুরু করলেন ;

"আমি আশা করেছিলাম আরও দু'টো একটা প্রশ্ন তুমি আমাকে করবে। যেমন, সরযুপ্রসাদ যখন ব্যাঙ্ক লুটের টাকা নিয়ে সরে পড়ল এবং চেহারা বদলাবার জন্য সম্ভবতঃ আমেরিকাতেই পাড়ি দিল—জানি না অপারেশনটা সে এদেশেই করিয়ে নিয়েছিল না ওজন্য ফের আমেরিকা চলে গিয়েছিল—যাই হোক, তখন সে আবার এ শহরেই ফিরে এল কেন যেখানে তার ধরা পড়ার আশঙ্কা থাকতে পারে। আর একটা প্রশ্ন সে এখানকার ব্যাঙ্কেই ম্যানেজার হয়ে তোমার শূন্য পদে এসে বসল কি করে? কেমন, দু'টোই সঙ্গত প্রশ্ন নয় কি?"

সুশান্ত ঘাড় নেড়ে সায় দিল।

"তা হলে এবার এর জবাব, আমার মনে যা এসেছে, তা খুলে বলি।

"সরযূপ্রসাদ স্বভাবে যাই হোক লেখাপড়ায় খুব খারাপ ছিল না। আমি খোঁজ নিয়ে জানলাম কলেজে ভালো ছাত্র ছিল বলেই এর সুনাম ছিল। ও ছিল অর্থনীতির ছাত্র ব্যাংকিং এবং কারেন্সী এই দুটো বিষয়ে পুঁথিগত বিদ্যা—যাকে বলে 'থিয়োরেটিক্যাল নলেজ', ওর খানিকটা ছিল, তারপর ও আমেরিকা চলে গেল। সেখানে গিয়ে ও নানা রকম শয়তানী শিখল। কুনীতি করতেও শিখল, কিন্তু শুধু ঐ করতেই তো কেউ আমেরিকায় যায় না, ও-ও তা যায় নি, আমার মনে যে সেখানে গিয়ে কোন একটা ব্যাঙ্কে অ্যাপ্রেন্টিস হয়ে হাতেকলমেও ও কিছু কাজ শিখেছিল।

"ব্যাঙ্ক ডাকাতির পর চেহারা বদলে আবার এখানে ফিরে না এসে ওর উপায় ছিল না, কেন না ডাকাতি তো শুধু ও একাই করে নি, ওর দু'জন শাকরেদও ছিল এবং তারা এখানেই রয়ে গিয়েছিল, যদি কোন দুর্বল মুহূর্তে ওদের কেউ একজন ধরা পড়ে যায় তা হলে সঙ্গে সঙ্গে ওর কথাও যে জানাজানি হয়ে যাবে এবং তখন ওর পক্ষে বিদেশে লুকিয়ে থেকেও আত্মগোপন করে থাকা সহজ হবে কিনা সন্দেহ। আর, তা ছাড়াও, সর্বদা লুকিয়ে লুকিয়ে কিংবা পালিয়ে পালিয়েই যদি বেড়াতে

হয় তা হলে আর এই বিপুল ঐশ্বর্য থাকার মানে কি? এই জন্যই পুলিশের ছোটকর্তা আর ঐ ক্যাশিয়ার বৈজুনাথকে চোখে চোখে রাখা ওর দরকার ছিল—অন্ততঃ কিছু দিনের জন্য। তবে ও-ই যে সরযূপ্রসাদ অর্থাৎ ত্রিবেদী আর সরযূপ্রসাদ যে একই লোক এ কথা ওরা তিনজন ছাড়া আর কেউ জানত না। বলাবে, সরযূপ্রসাদ যে প্ল্যাস্টিক সার্জারির সাহায্যে চেহারা বদলে ফেলে নতুন মানুষ হয়ে যাবে এটা ওদের না জানালেই হ'ত। কিন্তু সেটা হয়তো ও আগে ভেবে দেখেনি, ষড়যন্ত্র করার সময় কোন অসতর্ক মুহূর্তে বলে ফেলেছিল।

"দ্বিতীয় প্রশ্ন, এই ব্যাঙ্কে ও এল কি করে? এটার জবাবও যা মনে হয় এই রকম; এই শহরে নতুন চেহারা নিয়ে থাকতে গেলে একটা কিছু অবলম্বন নিয়ে থাকতে গেলে একটা কিছু অবলম্বন নিয়ে থাকতে হবে। তোমাকে যে ব্যাঙ্কের কর্তারা আর এখানে রাখবেন না এটা তো ও স্বতঃসিদ্ধ বলেই জানত। কাজেই তোমার জায়গায় যে একজন নতুন লোকের জন্য বিজ্ঞাপন দেওয়া হবে এটা ও অনুমান করেই নিয়েছিল। হ'লও তাই, আর বিজ্ঞাপন বেরোনো মাত্র ও সেই পদের প্রার্থী হয়ে দরখাস্ত পেশ করে দিল। ওর আমেরিকান ব্যাঙ্কের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা এ ব্যাপারে ওর সহায় হবে বলে ও জানত। কারণ ওখানে অ্যাপ্রেন্টিসদের সত্যি কাজ শিখিয়ে দেওয়া হয়। ওদেশে যারা কাজ করে তারা কাজের সময় কাজই করে, কাজই শেখে, ফাঁকি দিতে শেখে না। অবশ্য যখন কাজ থাকে না তখন আমোদ আহ্লাদ করতেও ওদের জুড়ি নেই।

একে আমেরিকান ব্যাঙ্কে হাতে কলমে শিক্ষাপ্রাপ্ত তার ওপর স্মার্ট, চট্‌পটে, বলিয়ে কইয়ে লোক, অনর্গল ইংরেজি বলতে পারে—এমন লোকই তো ব্যাঙ্কের কর্তারা পছন্দ করবেন; কাজেই ওর পক্ষে ব্যাঙ্কের ম্যানেজারের পদটি পাওয়া বেশি কঠিন হয় নি। তা ছাড়া এদেশের কর্তা ব্যক্তিদের তো এখনও ও-সব দেশের ওপর প্রচণ্ড মোহ আছে। কাজেই ওর সঙ্গে ইণ্টারভিউ এর পাল্লা দিয়ে এখানকার ছেলেরা পারবে কেন? সহজেই ও এ কাজটা পেয়ে গেল। বাড়তি লাভ হ'ল তোমাকেও আপাততঃ কিছু দিন ও চোখে চোখে রাখতে পারবে। তার পর তুমি চলে গেলে? —থোড়াই এসে গেল ওর।"

কথায় কথায় বেলা পড়ে আসছিল। সতীনাথবাবু হঠাৎ যেন সম্বিৎ ফিরে পেয়ে বললেন, "যাক, এবার নিশ্চিন্ত থেকো, তোমার এখানকার কাজ হাতছাড়া হবে না। তবে এবার থেকে আরও ট্যাক্টফুল হ'তে হবে তোমাকে। হঠাৎ উত্তেজিত হয়ে কোন কাজ করা চলবে না। ভালো কথা, তোমার ভগলু বাবাজীকে একটু ডাকো তো!"

"কেন কাকা?"

"বাঃ, চা খেতে হবে না? বেলা কি কম হয়েছে? চা খেয়ে নিয়ে চল, একবার ঐ তিন 'মহাপ্রভুকে' আর একবার দর্শন করে আসি। কালই তো ওঁরা সদলে সদরে চালান যাবেন। তা ছাড়া এস্‌. পি. মিষ্টার বাজপেয়ীকে কথা দিয়েছি, তিনি চলে যাবার আগে আর একবার তাঁর সঙ্গে দেখা করব। সেটাও সেরে নেওয়া যাবে। তুমিও সঙ্গে চল, তোমাকে দেখলে মিস্টার বাজপেয়ী খুশি হবেন। তারপর সময় পেলে, থানার বড়কর্তার ঘরে গিয়ে তাঁর সদ্যরচিত হিন্দী কবিতাও কিছু শুনে আসা যেতে পারে। তুমি সঙ্গে থাকলে উনি আরও খুশি হবেন, কারণ আমি ওঁকে জানিয়ে দিয়েছি যে তুমিও একজন কবি। দুই কবির একত্র সমাবেশে থানার কঠিন পরিবেশ অন্ততঃ খানিকক্ষণের জন্য বদলে রসাল হয়ে যেতে পারে। আর একটা কথা, উনি যখন কবিতা পড়বেন তখন কিন্তু থেকে থেকে কেয়াবাৎ কেয়াবাৎ বলতে ভুলো না। ওটাই এদেশের এটিকেট।" —বলেই সতীনাথ বাবু তাঁর স্বভাবসুলভ উচ্চহাস্যে ঘরের থম্‌থমে পরিবেশটাকে আর একবার পালটে দিলেন।

16 টাউনসেণ্ড রোড, কলিকাতা-25

সমাপ্ত

ক্ষিতীন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্যের

তিনটি বিজ্ঞানভিত্তিক রহস্য উপন্যাস

মেঘনাদ ৮·০০ লুপ্তধন ১০·০০ তুষারলোকের রহস্য ৮·০০

শৈব্যা প্রকাশন বিভাগ ● কলিকাতা-৭৩

চারুচন্দ্র ভট্টাচার্য স্মরণে

রতনমোহন খাঁ

একশো বছর আগে 1883 সালের 29 জুন চব্বিশ পরগনা জেলায় হরিনাভি গ্রামে একটি সাধারণ মধ্যবিত্ত পরিবারে চারুচন্দ্রের জন্ম হয়। পিতার নাম কান্তকুমার ভট্টাচার্য, মাতার নাম মেনকা দেবী। নাটুকে রামনারায়ণ এই বংশেরই পূর্বপুরুষ। তিনি ছিলেন চারুচন্দ্রের ঠাকুরদাদার কাকা। রামনারায়ণ সম্পর্কে তথ্যাদি ও কাগজপত্র চারুচন্দ্র শ্রদ্ধার সঙ্গে রক্ষা করেছিলেন এবং ঐ সব তথ্য ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়কে দেন। রামনারায়ণের অভিনয় দেখেই মাইকেল মধুসূদন নাটক লিখতে আগ্রহী হন। আবার একটি কাকতালীয় ঘটনা হলো মধুসূদনের মৃত্যুর দশ বছর পরে ঠিক মৃত্যু তারিখে চারুচন্দ্রের জন্ম।

শৈশব থেকেই চারুচন্দ্র অত্যন্ত মেধাবী ছিলেন। দশ বছর বয়সে গ্রামের স্কুল ছেড়ে কলিকাতায় মেট্রোপলিটন স্কুলে ভর্তি হন। 1899 সালে এণ্ট্রান্স পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে মেট্রোপলিটন (বর্তমানে বিদ্যাসাগর) কলেজ থেকে 1901 সালে এফ এ. পাশ করেন। 1903 সালে প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে বি. এ. পাশ করে পর বৎসরই পদার্থবিদ্যায় এম. এ. ডিগ্রী পান। ঐ সময় বিজ্ঞানের জন্যে পৃথক ডিগ্রী ছিল না। প্রেসিডেন্সি কলেজে তাঁর শিক্ষকদের মধ্যে ছিলেন আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু, আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় ও মিস্টার পার্সিভাল। এম. এ. পড়ার সময়ই আচার্য বসুর কাছে গবেষণার কাজ শুরু করেন।

1905 সালে প্রেসিডেন্সি কলেজে চারুচন্দ্র যোগ দেন এবং দীর্ঘদিন পরীক্ষাগারের দায়িত্বে থেকে 1940 সালে অবসর গ্রহণ করেন। তিনি ছিলেন আদর্শ শিক্ষক। নিয়ম-মাফিক পাঠ ছাড়াও তৎকালীন বিজ্ঞানে নানা আবিষ্কার ও প্রয়োগের আলোচনা ছিল তাঁর ক্লাসগুলির বড় আকর্ষণ। তাঁর কৃতী ছাত্রদের মধ্যে ছিলেন শিশিরকুমার মিত্র, প্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশ, সত্যেন্দ্রনাথ বসু, মেঘনাদ সাহা, জ্ঞানচন্দ্র ঘোষ, জ্ঞানেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় প্রমুখ।

উনিশ শতকটিকে বাঙালীর সমাজ ও সংস্কৃতির স্বর্ণযুগ বলা যায়। বিগত শতাব্দীর গৌরবময় ঐতিহ্যের ধারক ও বাহকদের মধ্যে চারুচন্দ্র হলেন অন্যতম। তিনি শুধু বিজ্ঞানের শিক্ষক ছিলেন না, বিষয় সম্বন্ধে তাঁর ছিল

যেমন জ্ঞানের গভীরতা তেমনি ছিল সহজ, সরল ও সরস প্রকাশভঙ্গী। উৎকৃষ্ট বিজ্ঞান প্রবন্ধ লিখতে হলে বৈজ্ঞানিক তত্ত্বের সঙ্গে যে নিবিড় পরিচয় থাকা দরকার, যে সাহিত্যিক মেজাজ দরকার সেসব গুণই চারুচন্দ্রের মধ্যে ছিল। তাঁর প্রথম বিজ্ঞান-গ্রন্থ 'নব্যবিজ্ঞান' প্রকাশিত হয় 1918 সালে। তাঁর সব কটি বিজ্ঞান গ্রন্থই প্রকাশিত হয়েছে 1953 সালের মধ্যে। বিজ্ঞানের আবিষ্কার, তত্ত্ব, বিজ্ঞানীদের জীবন প্রভৃতি বিষয় নিয়ে পুস্তকগুলি রচিত। প্রতিটি পুস্তকই সুখপাঠ্য ও সাধারণের বোধগম্য।

'বসুধারা' মাসিক পত্রিকার প্রথম সংখ্যা প্রকাশিত হয় বাংলা 1364 সালের বৈশাখে। প্রথম কয়েকটি সংখ্যার সম্পাদনা করেন অধ্যাপক নির্মলকুমার বসু। এরপর সম্পাদকের দায়িত্বে আসেন চারুচন্দ্র। আমৃত্যু তিনি এই দায়িত্ব পালন করে গেছেন নিষ্ঠার সঙ্গে। নবীন লেখকদের তিনি ছিলেন শুভাকাঙ্ক্ষী। বসুধারায় প্রকাশিত সূত্রধর ছদ্মনামে তাঁর অথ-নট--ঘটিত রচনা তৎকালীন যুগের

নট-নাটক, রঙ্গমঞ্চ, অভিনয়াদি সম্পর্কে চমৎকার তথ্যপূর্ণ ইতিহাস। মৃত্যুর কয়েক মাস আগে প্রকাশিত 'কবি স্মরণে' (1961 খৃঃ) গ্রন্থটি যে কোন যুগে রবীন্দ্র পরিক্রমার সহায়ক হবে। বঙ্গীয় সমবায় সংগঠন সমিতি প্রকাশিত 'ভাণ্ডার' পত্রিকাটিও তিনি বেশ কয়েক বৎসর সম্পাদনা করেছিলেন।

তাঁর জীবনের আর একটি উল্লেখযোগ্য দিক হলো বিশ্বভারতীর গ্রন্থন বিভাগের পুনর্বর্দ্ধন। 1922 সালে বিশ্বভারতী প্রতিষ্ঠিত হলে রবীন্দ্রনাথ গ্রন্থন বিভাগের ভার অর্পণ করেন চারুচন্দ্রের উপর। 1922 সাল থেকে 1957 সাল পর্যন্ত তিনি এই দায়িত্বে ছিলেন। আবার মৃত্যুর তিন মাস আগে ঐ বিভাগের কর্ণধার হন। স্বল্পপরিসরে ও স্বল্পমূল্যে বিশ্ববিদ্যা-সংগ্রহ এবং সাধারণের জন্যে লোক-শিক্ষা গ্রন্থমালা প্রকাশের পরিকল্পনা তাঁরই। এই সিরিজের প্রথম বই কবিগুরুর 'সাহিত্যের স্বরূপ' (1350 বঙ্গাব্দ)। রবীন্দ্রনাথের সমগ্র রচনা একত্রে প্রকাশের পরিকল্পনাও তাঁরই। চারুচন্দ্রের কর্মে ও গুণে মুগ্ধ হয়ে কবিগুরু 'সে' গ্রন্থটি চারুচন্দ্রের নামে উৎসর্গ করেন।

বহু সংস্থার সঙ্গে তিনি সক্রিয়ভাবে যুক্ত ছিলেন। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বানান পরিভাষা কমিটির সম্পাদক, বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদের সহ-সভাপতি, অবনীন্দ্র পরিষদের সহ-সভাপতি, ভারত সভার সভাপতি ও বঙ্গীয় প্রকাশক সমিতির সভাপতি হিসাবে তাঁর সাংগঠনিক শক্তির পরিচয় পাওয়া যায়। তাঁর কর্মময় জীবনের অবসান হয় 1961 সালের 26 আগষ্ট।

10 গ্যালিফ স্ট্রীট, ব্লক-6, স্যুইট-7I, কলি-3

র‍্যাফেল-রোজা উপাখ্যান

গোপাল ভৌমিক

রুশ বিজ্ঞানী পত্রোভিচ পাভলভ একজোড়া শিম্পাঞ্জীকে পোষ মানিয়েছিলেন। কর্তার নাম র‍্যাফেল এবং গিন্নীর নাম রোজা। র‍্যাফেল আর রোজার জন্য তৈরী করে দেওয়া হয়েছিল চমৎকার একটা বাড়ি। কোন কিছুর অভাবটি ছিল না সেই বাড়িতে। আলাদা আলাদা ঘর ছিল শোওয়া, খাওয়া, স্নানকরা, বসা, খেলার জন্যে। শোবার ঘরে ছিল চমৎকার দুটি বিছানা। বিছানার পাশে একটি করে টেবিল। খাবার ঘরে সাদা টেবিলক্লথে ঢাকা টেবিল। আলমারিতে থরে থরে সাজানো খাবার। গোটা বাড়িটায় এমনি সব বন্দোবস্ত। মনে হত না যে গৃহস্থলি মানুষের জন্য নয় একজোড়া শিম্পাঞ্জীর জন্য।

কিন্তু দেখা গেল, যাদের জন্যে এত বন্দোবস্ত তারা ব্যাপারটাকে ঠিক বরদাস্ত করতে পারছে না। খাবার টেবিলে বসে তারা চামচ সরিয়ে রেখে নিতান্ত অভদ্রের মতো জিব দিয়ে চেটে চেটে পুডিং খায়। রাত্রে কোথায় বালিশে মাথা দিয়ে শোবে তা না, বালিশগুলোকে মাথায় চাপায়।

কিন্তু তা বলে রোজা আর র‍্যাফেল পুরোপুরি বুনো থেকে যায় নি। কোন কোন ব্যাপারে তাদের চালচলন প্রায় মানুষের মতো হয়ে উঠেছিল।

যেমন রোজা করতো কি, পেছন থেকে চুপি চুপি এসে দরোয়ানের পকেট থেকে চাবি তুলে নিত। তারপর খাবার-ঘরে বসে চাবি ঘুরিয়ে আলমারির পাল্লা খুলতো। তারপর একটা চেয়ার টেনে এনে আলমারির সামনে বসে মহানন্দে আঙুর আর অ্যাপ্রিকট খেত।

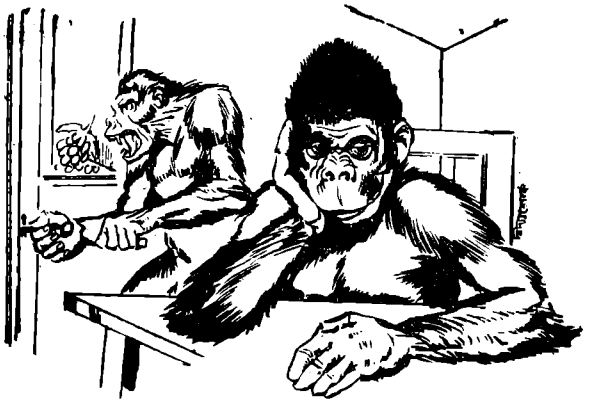

র‍্যাফেল ও রোজা

আর র‍্যাফেলের বাহাদুরি ছিল আরও বেশী। একটা ঘরের মাঝখানে সিলিং থেকে একগোছা অ্যাপ্রিকট ঝুলতো আর ঘরের মধ্যে রেখে দেওয়া হত কয়েকটা ছোটবড় চৌকোনো ব্লক। ব্লকগুলো ওপর ওপর সাজাতে পারলে তবেই অ্যাপ্রিকটের নাগাল পাওয়া সম্ভব—নইলে কিছুতেই নয়। আবার সাজাবার সময়েও সবচেয়ে বড় ব্লকটি বসাতে হবে একেবারে নিচে। তার ওপরে পর পর ছোটগুলো।

জঙ্গলে থাকার সময় র‍্যাফেল অনেকবার গাছের মগডালে উঠে ফল পেড়েছে। কিন্তু ব্লক সাজিয়ে ফল পাড়া একেবারে নতুন। গোড়ার দিকে হিমসিম খেয়ে যেত।

এ সময়ে র‍্যাফেলকে দেখে সত্যি মনে হত মানুষ আর তার মধ্যে কোন তফাৎ নেই। কাজের ফাঁকে ফাঁকে যখন সে গালে হাত দিয়ে বসে থাকতো সত্যিই মনে হত সে একটা কঠিন সমস্যা নিয়ে গভীরভাবে চিন্তা করছে।

21/13, বিহারীলাল পাল স্ট্রীট, বরানগর, কলি-36

বিজ্ঞানভিত্তিক ধারাবাহিক উপন্যাস

সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ

সবুজ বনের গান

[পাঁচ]--রাজাকোর ঘরে-হানা

রোমিলার পোশাকও একেবারে ভারতীয় মেয়েদের মতো। শাড়ি ও ব্লাউসপরা। শুধু খোঁপাটা মাথার মাঝখানে চুড়ো করে বসানো—প্রাচীন যুগের মুনিকন্যাদের মতো। গলায় সেইরকম রুদ্রাক্ষের মালা।

আমি হাঁ করে তাকিয়ে আছি দেখে ইংরেজিতে সে বলল, 'আপনি নিশ্চয় অবাক হয়েছেন। আমার হতভাগ্য বাবার নাম রাজাকো বার্দান, কাল যাকে নৃশংসভাবে খুন করা হয়েছে আপনারই সামনে।'

দুঃখিতভাবে বললাম, 'কথাটা ঠিকই মিস রোমিলা! কিন্তু আমার কিছু করার ছিল না। দুজনের মধ্যে তখন প্রায় আড়াইশো গজ দূরত্ব। তা ছাড়া সন্ধ্যা হয়ে এসেছিল। আমি দৌড়ে যেতে-যেতে খুনীরা পালিয়ে যায়।'

রোমিলা বলল, 'না মিঃ চৌড্রি! আমি কোনো অভিযোগ নিয়ে আপনার কাছে আসি নি। এই সামোয়া হোটেলের রিসেপসনিস্ট তোতিলাবতী আমার বন্ধু। তার কাছেই আপনার কথা কাল রাতে শুনেছি। তোতিও খুব পস্তাচ্ছে। সে প্রথমে নাকি আপনার কথায় গুরুত্ব দেয় নি। আসলে বাবার খুবই বদনাম ছিল এখানে।'

'আগে আপনি বসুন প্লিজ।'

রোমিলা বসে বলল, 'আপনার সঙ্গী ভদ্রলোকেরা নিশ্চয় ডঃ বিকর্ণের বাড়ি গেছেন?'

'আপনি কীভাবে জানলেন?'

রোমিলা একটু হাসল। 'ডঃ বিকর্ণ যখন জাকার্তার বিশ্ববিদ্যালয়ে উদ্ভিদবিদ্যার প্রধান অধ্যাপক ছিলেন, তখন আমি তাঁর ছাত্রী ছিলাম। উনি আমাকে খুব স্নেহ করতেন। সত্যি বলতে কী, আমারই তাগিদে উনি কোকোসে এসে স্থায়ীভাবে বাড়ি করে বাস করছেন। ওঁকে বলেছিলাম, আমাদের এসব দ্বীপে উদ্ভিদ নিয়ে গবেষণার প্রচুর সুযোগ আছে। আমি ওঁকে সাহায্য করতে পারি।'

খুব আগ্রহ জাগল রোমিলা সম্পর্কে। বললাম, 'আপনি এখন কী করেন?'

রোমিলা বলল, 'আমার দুর্ভাগ্য মিঃ চৌড্রি! জাকার্তা বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ার সময় মা মারা যান। বাবা অসহায় হয়ে পড়েন। তাই বাধ্য হয়ে পড়াশুনো ছেড়ে ফিরে আসি এখানে। বাবার একমাত্র সন্তান আমি। এঁর মাছের কারবার দেখাশোনা করছি এই একটা বছর। ওর মধ্যে ডঃ বিকর্ণ রিটায়ার করে চলে আসেন আমার কথামতো। কিন্তু আমি ওঁর কোনো কাজে লাগবার সময়ই আর পাই নি। বাবা উড়নচণ্ডী মানুষ। খালি টো টো করে ঘুরে বেড়াতেন। তাই আমাকে সব দেখাশুনো করতে হয়েছে।'

রোমিলার কণ্ঠস্বর সুমিষ্ট এবং আচরণ খুব নম্র। বললাম, 'আপনার সঙ্গে আলাপ হয়ে ভাল লাগল রোমিলা! বিশ্বাস করুন, আপনার বাবার ব্যাপারটাতে...'

কথা কেড়ে রোমিলা বলল, 'বুঝতে পারছি। কিন্তু কীভাবে বাবাকে ওরা খুন করল, আপনার মুখ থেকে জানবার জন্যেই এসেছি মিঃ চৌড্রি। রুবি দ্বীপের পুলিশ মাথা ঘামাবে না, জানি। বিশেষ করে আমার বাবার জুয়াড়ী মাতাল বলে ভীষণ বদনাম ছিল। আপনি কি দয়া করে কী ঘটেছিল বলবেন?'

পুরো ঘটনা সবিস্তারে বললাম। শোনার পর রোমিলা চাপা একটা নিঃশ্বাস ফেলে বলল, 'হুঁ—কাত্তি শব্দটা বাবার মুখে শুনেছি। ঘুমের ঘোরে উচ্চারণ করতেন। পরে জিজ্ঞেস করলে বলতেন, ও কিছু না। তা হলে দেখেছি, মৃত্যুর মুহূর্তেও বাবা কাত্তি শব্দটা উচ্চারণ করেছিলেন! আচ্ছা মিঃ চৌড্রি, কাত্তি জিনিসটা কী?'

ওকে বলি নি যে, রাজাকোর টুপি আমি কুড়িয়ে এনেছিলাম এবং টুপির ভেতরে সত্যি কাত্তি পেয়েছি। বললাম, 'শুনেছি, কাত্তি হল প্রাচীন পর্তুগিজ জলদস্যুনেতার তামার পদক। ফলকও বলতে পারেন। যে দস্যুনেতা একশো

জাহাজ লুঠ করতে পারত, সে ওই পদক গলায় ঝুলিয়ে রাখত।'

রোমিলার জন্যে ফোনে নিচের ক্যান্টিনে কফির অর্ডার দিলাম। রোমিলা অন্যমনস্ক রইল কিছুক্ষণ। তারপর ফের চাপা নিঃশ্বাস ফেলে বলল, 'বাবা মারা গেছেন। তাই আপনাকে জানাতে বাধা নেই। ছোটবেলায় মায়ের কাছে শুনেছি, বাবা জলদস্যুদের দলে ছিলেন একসময়।'

উত্তেজনা চেপে রেখে বললাম, 'তাই বুঝি? আমাকে বলছিলেন, তিমিশিকার করে বেড়াতেন অ্যান্টার্কটিকায়।'

'সে অনেক পরে।' রোমিলা হঠাৎ আমার চোখে চোখ রেখে বলল, 'মিঃ চৌড্রি কি বলবেন আপনাদের এখানে আসার উদ্দেশ্য নিছক বেড়ানো—নাকি অন্য কিছু?'

'কেন এ প্রশ্ন?'

'আপনার সঙ্গীরা কাল বিকেলে ডঃ বিকর্ণর বাড়ি গিয়েছিলেন মিলিটারি গাড়িতে। সকালেও ফের গেলেন দেখলাম। তাই সন্দেহ জাগছে।'

'কিসের সন্দেহ?'

'আমাদের সরকার ডঃ বিকর্ণকে বহুদিন আগে কিওটা নামে এক ভূতুড়ে দ্বীপের স্পিকিং উডস অর্থাৎ কথা বলা বনের রহস্য উন্মোচনের দায়িত্ব দিয়েছেন। ডঃ বিকর্ণ নিজেই আমাকে বলেছেন একথা। উনি সরকারী অর্থসাহায্যে এ নিয়ে রিসার্চ করছেন। আমাকে ও'র অ্যাসিস্ট্যান্ট হবার কথা দিয়েছিলেন। কিন্তু প্রথম কথা, আমার যোগ্যতা কম।' দ্বিতীয় কথা বাবার মাছের কারবার নিয়ে আমি ভীষণ জড়িয়ে আছি।

একটু ইতস্তত করে বললাম, 'আপনি বুদ্ধিমতী শিক্ষিতা মেয়ে রোমিলা! আপনাকে বলতে দ্বিধার কারণ দেখি না, আমরা এসেছি কিওটা দ্বীপের খোঁজে।'

রোমিলা ম্লান হাসল। 'কিওটা রূপকথা বা নিছক কিংবদন্তী হতেও তো পারে। ছোটবেলা থেকে শুনে আসছি এই ভূতুড়ে দ্বীপের কথা। এখানকার আদিবাসীদের লোককথায় কিওটা দ্বীপের গল্প আছে। ওরা তা বিশ্বাসও করে। দুদিন পরে শুক্লপক্ষ আসছে। চাঁদ দেখা গেলেই ওরা ফুলের পোশাক পরে বনদেবতার পুজোয় মেতে উঠেছে। নিছক ধর্মীর সংস্কার মিঃ চৌড্রি!'

'কিন্তু আপনাদের সরকার তা হলে কেন ডঃ বিকর্ণকে কিওটার রহস্য উন্মোচনের দায়িত্ব দিয়েছেন—যদি এর মধ্যে কোনো সত্য নাই থাকবে?'

'সত্যটুকু কী, বলি শুনুন। বছর দুই আগে একদল জেলে সমুদ্রে মাছ ধরতে গিয়েছিল। তারা যখন ফিরে এল, তখন দেখা গেল, তারা এক অদ্ভুত রোগে ভুগছে। গায়ের চামড়া জায়গায় জায়গায় সবুজ অ্যালার্জির মতো চিহ্ন। অবিকল গাছের পাতা আঁকা যেন। হাসপাতালে তাদের ভর্তি করা হল। কিন্তু একে-একে সবাই মারা পড়ল। মৃত্যুর পর দেখা গেল, প্রত্যেকটি লাস ঘন সবুজ হয়ে গেছে। সেই থেকে আমাদের সরকার ব্যাপারটা নিয়ে উদ্বিগ্ন।'

'আশ্চর্য! আঠারো শতকে টমাস কুকের জাহাজী লগবুকে সবুজ অ্যালার্জির কথা আছে।'

পরিচারক ট্রেতে কফি রেখে গেল। দুজনে কফি খেতে থাকলাম। তারপর রোমিলা বলল, 'বাবা ওদের দেখতে গিয়েছিলেন। বাবার কাছে শুনেছি, কখনও-কখনও এ অঞ্চলে জেলেদের এই অদ্ভুত অসুখ হয়। কেউ বাঁচে না। বাবাও খুব কুসংস্কারগ্রস্ত মানুষ ছিলেন। বলতেন, ওরা নিশ্চয় কিওটা দ্বীপে গিয়ে পড়েছিল।'

'তা হলে আপনার বাবাও বিশ্বাস করতেন একথা?'

'বাবার কথা ছেড়ে দিন। নিরলস মানুষ ছিলেন। চিরজীবন সমুদ্রচর। সমুদ্রে যারা ঘোরে, তারা অসংখ্য আজগুবি ব্যাপার বিশ্বাস করে।'

'আচ্ছা রোমিলা, আপনার বাবা কি কখনও কিওটা দ্বীপ খোঁজার চেষ্টা করেছিলেন?'

'হ্যাঁ। বললাম তো, বাবা ছিলেন বেয়াড়া আর বাতিকগ্রস্ত মানুষ। একবার আমাদের জেলেরা মাছ ধরে আনল ট্রলারে। বাবা সেবার সঙ্গে যান নি। হঠাৎ দেখা গেল, একটা মাছের রঙ সবুজ। বাবার অমনি বাতিক চাড়া দিল। বেরিয়ে পড়লেন ট্রলার নিয়ে সেই এলাকায়। কদিন পরে হন্যে হয়ে ফিরে এলেন। সেই সবুজ মাছটা আমি ডঃ বিকর্ণকে দিয়ে এসেছিলাম। ওটা এখনও ও'র জারে জিয়ানো রয়েছে।'

রোমিলার সঙ্গে গল্প করতে করতে দশটা বেজে গেল। রোমিলাকে বিদায় দিতে দরজার বাইরে গেছি, হঠাৎ সে বলল, সময় থাকলে আসুন না আমার ওখানে। না-না। মাছের আড়তে যেতে বলছি না আপনাকে।' সে একটু হাসল। 'আড়তে মাছের গন্ধে টিঁকতে পারবেন না এক মুহূর্ত। আমার বাড়িতে আসুন। অবশ্য যদি আপত্তি না থাকে!'

'কোনো আপত্তি নেই।' বলে তাকে নিচে রিসেপশানে অপেক্ষা করতে বলে ঝটপট সেজে নিলাম। পকেটে রিভলভার নিতে ভুললাম না।

রোমিলা হাল্কা নীল রঙের একটা টুসিটার ছোট্ট মোটরগাড়ি এনেছিল। হোটেল এলাকা ছাড়িয়ে সমুদ্রের

ধারে ধারে সুন্দর রাস্তা দিয়ে এগোল গাড়িটা। যেদিকে তাকাই, রঙবেরঙের ফুল। বড়-বড় ব্রেডফুড়ের গাছে তরমুজের মতো ফল ঝুলছে। পামগাছে বাহারী অর্কিডের ঝালর। সমুদ্র ডাইনে রেখে অনেক সবুজ টিলার গা ঘেঁষে এবং চড়াইউৎরাই ভেঙে রোমিলাদের বাড়ি পেঁছিলাম। বাড়িটা একটা টিলার মাথায়। রাজাকো যে পয়সাওলা লোক ছিল, বোঝা যাচ্ছিল এবার। বাড়িটা ছোট হলেও বড় সুন্দর। ফুলবাগান আর বিচিত্র সব গাছপালার ভেতর ছবির মতো রঙীন বাড়িটা দেখে মনে হল, এর পেছনে যেন শিল্পীর স্বপ্ন রয়ে গেছে। কে সেই শিল্পী—রাজাকো, না তার মেয়ে?

গেটের কাছে গিয়েই রোমিলা বলে উঠল, বাড়িতে অতিথি এসেছেন মনে হচ্ছে!'

দেখি, সেই মিলিটারি স্টেশনওয়াগনটা দাঁড়িয়ে রয়েছে লনের পাশে। ড্রইং রুমে ঢুকে রোমিলা বলল, 'কী সৌভাগ্য কী সৌভাগ্য! আমার ঘরে এত সব গণমান্য অতিথি। আর আমি কি না বাইরে কাটাচ্ছিলাম!'

কর্নেল, ব্যুগেনভিলি এবং একজন অতিবৃদ্ধ ভদ্রলোক কফির পেয়ালা হাতে বসে রয়েছেন। রোমিলা বলল, 'মিঃ চৌড্রি, ইনিই আমার প্রফেসর ডঃ বিকর্ণ [আর এঁরা নিশ্চয় আপনার সঙ্গী! '

ডঃ বিকর্ণ কর্নেল ও ব্যুগেনভিলির পরিচয় করিয়ে দিলেন। পরস্পর আনুষ্ঠানিক পরিচয়পর্ব শেষ হলে ডঃ বিকর্ণ বললেন, 'রোমি! এঁদের তোমার কাছে নিয়ে এলাম একটা জরুরী দরকারে। তা ছাড়া তোমার বাবার শেষকৃত্যে পেঁছিতে পারি নি একটা কৈফিয়ত দেওয়ারও প্রয়োজন ছিল।'

রোমিলা মৃদু স্বরে বলল, 'আপনাকে আসতে তো নিষেধ করেছিলাম রাত্রে!'

বললাম, 'শেষকৃত্য কি রাতেই হয়ে গেছে?'

ডঃ বিকর্ণ বললেন, 'হ্যাঁ। এখানকার পুলিসের ব্যাপার এরকম। মর্গে পর্যন্ত নেয় নি বডি।'

'সে কী!'

কর্নেল বললেন, 'যস্মিন দেশে যদাচার। তো জয়ন্ত, তোমার শরীর নিশ্চয় যথেষ্ট সুস্থ?'

রোমিলা ভেতরে চলে গেল। বললাম, 'সুস্থ না হলে এলাম কী করে? মিস রোমিলা গিয়েছিলেন ওঁর বাবার হত্যাকাণ্ড সম্পর্কে জানতে। তারপর ওঁর সঙ্গে চলে এলাম।'

কর্নেল বললেন, যস্মিন দেশে যদাচার

একটু পরে রোমিলা ব্যস্তভাবে এসে বলল, 'একটা অদ্ভুত ব্যাপার ঘটেছে। এইমাত্র হঠাৎ চোখে পড়ল—পেছনের একটা ছোট্ট ঘরে পুরানো আমলের কিছু জিনিস-পত্র বাবা রাখতেন। সেই ঘরের দরজার সেফটি লক ভাঙা। আমার পরিচারিকা এবং অন্য কর্মচারী দুজন আছে, তারা কেউ কিছু বলতে পারছে না। তাছাড়া বাইরে থেকে বোঝাও যায় না দরজার লক ভাঙা হয়েছে। আমার কুকুর পাণ্ডো দরজার সামনে দাঁড়িয়ে কপাটে আঁচড় কাটছিল। তাই সন্দেহ হল। তখন ঠেলে দেখি, খুলে গেল দরজা। কিছু হারিয়েছে কিনা তাও বুঝতে পারছি না।'

ডঃ বিকর্ণ, কর্নেল এবং ব্যুগেনভিলি উঠে দাঁড়ালেন উত্তেজিতভাবে। কর্নেল বললেন, 'চলুন তো দেখি।'...

(ক্রমশঃ)

রকমারি ধনেশ পাখি

অজয় হোম

পৃথিবীতে 45টি প্রজাতির ধনেশ আছে। ভারতে 6টি গণে মাত্র 8টি প্রজাতি। খাদ্যে ও স্বভাবে প্রায় একরকম। পশ্চিমবঙ্গ ও বাংলাদেশে যাদের দেখা যায় তারা হলো—

1. **পুটিয়াল ধনেশ** (টোক্কাস বিরসট্রিস)। হিন্দী—চালোত্রা, ধানমারি ধনেল, ধানদ, লামভার। ইংরেজি—কমন গ্রে হর্নবিল। দীর্ঘবাল গণের (টোক্কাস) এক প্রজাতি।

পুটিয়াল ধনেশ লম্বায় 61 সেমি (4 ইঞ্চি)। স্ত্রী-পুরুষ প্রায় একই দেখতে। উপরের পালক ফিকে পাটকিলে ধূসর; চোখের উপর সরু সাদাটে টান; গাল ও কানের উপরের পালক কালচে-ধূসর। ওড়ার পালক গাঢ় পাটকিলে. প্রতিটি পালকের ধার ও ডগা ধূসর বা সাদা। পাটকিলে লেজ লম্বা, সরু থেকে মোটা, প্রতিটি পালকের প্রায় শেষাংশে সবুজ আভার গাঢ় পাটকিলে পটি এবং ডগায় সাদা ছোপ। চিবুক থেকে বুক ধূসর তারপর ক্রমে পেটে সাদায় পরিণত। কনীনিকা লালচে পাটকিলে; পা গাঢ় সীসে। কালো ডগায় একটু সাদা বাকিটা হলুদ চঞ্চু বড়ো ও বাঁকানো এবং চাপা। কালো বা কালচে-পাটকিলে শিরস্ত্রাণ ছোটো ছুঁচলো। চোখের পাতায় কালো পক্ষ স্ত্রী পাখির শিরাস্ত্রাণ কিছুটা ছোটো কনীনিকা পাটকিলে।

বাসস্থান—ভারতে 2টি প্রজাতি। প্রথম (টো বিরসট্রিস) —পাকিস্তান, পাঞ্জাব, উত্তরপ্রদেশ, নেপাল, বিহার, মধ্যপ্রদেশ, পশ্চিমবঙ্গ, ওড়িশা, অন্ধ্র, মাদ্রাজ, মহীশূর, গুজরাট আবুপর্বত থেকে কুনুরঘাট, এবং পালনি শহরে হাজার ফুটের ভিতর। দ্বিতীয় 'মালাবার গ্রে হর্নবিল' (টো গ্রিসিউস)—পশ্চিমঘাট, বোম্বাই, কেরালা এবং সিংহলে 5 হাজার ফুটের মধ্যে।

স্বভাব—পুটিয়াল ধনেশ খুব গভীর জঙ্গলে বাস করে না। ভিজে স্যাঁতসেতে জায়গাও পছন্দ করে না। শহর বা গাঁয়ের কাছেই দেখা যায়। মেদিনীপুর এবং সুন্দরবন অঞ্চলের খোলামেলা জায়গায় আমার নজরে পড়েছে। দলপতির সঙ্গে ছোটো দলেই ঘোরাফেরা করে। ডাক বেশ জোর—'ক-ক-ক-কিই' এবং এর সঙ্গে চিলের ডাকের কছুটা মিশ্রণ। ওড়ায় পাখার আওয়াজ হলেও খুব জোরে

পুটিয়াল ধনেশ

হয় না।

প্রজননকাল মার্চ থেকে জুন। ডিম পাড়ে 2-3 টি অমসৃণ ভঙ্গুর মলিন সাদা। ডিমের মাপ—লম্বায় 1·7, চওড়ায় 1·22 ইঞ্চি (41·9 × 30·0 মিমি)।

2. **ঝুঁটি ধনেশ** (রাইটিসেরস আনডিউলেটাস)। অসমিয়া—মাহ-ডো-লা। কাছাড়ি—দাও-রাই। ইংরেজি রিদভ্ হর্নবিল। বলিচঞ্চু গণের (রাইটিসেরস) প্রজাতি।

লম্বায় 114 সেমি (45 ইঞ্চি)। কপালের উপর থেকে একটা গাঢ় (বেগুনি-বাদামী) লালের লাইন খানিকটা ঝুঁটির মতন মাথার চাঁদির পরে চওড়া হয়ে ঘাড়ের কাছ পর্যন্ত। ঘাড় কালো। চাঁদি, মাথা ও ঘাড়ের দু'পাশ সাদা এবং কিছুটা জরদাভ, বিশেষত যেখানে বাদামী-লালের সঙ্গে মিশেছে। লেজ সাদা এবং হলুদাভ। চিবুক ও গলা পালকহীন; উজ্জ্বল হলুদের উপর কালো টান, চামড়ার থলির ন্যায়। ইচ্ছা করলে ফুলাতে পারে। বাকি পালক কালো, তার উপর ইস্পাত সবুজের আভা। কনীনিকা কমলা-লাল। চঞ্চুর উপর মলিন হলুদ শিরস্ত্রাণ খুবই ছোটো এবং করোগেট টিনের মতন ঢেউখেলানো, ঢেউয়ের মাঝের রঙ গাঢ় লালচে। উপর ও নিচের চঞ্চুর গোড়ায় উঁচু নিচু খোদল করা। মোম-হলুদ চঞ্চুর উপর নিষ্প্রভ কমলার আভা। পা সবুজাভ-স্লেট। স্ত্রী-পাখির কেবল লেজ সাদা এবং গলার চামড়া উজ্জ্বল নীল, তার উপর কালো টান।

বাসস্থান—পশ্চিমবঙ্গের ডুয়ারস্ এবং আসাম থেকে ব্রহ্মদেশ, ইন্দোচীন ও মালয়েশিয়া। ভারতে 2টি প্রজাতি প্রথম (বা আনডিউলেটাস)—পশ্চিমবঙ্গ, আসাম ও বাংলা-দেশে 8 হাজার ফুট পর্যন্ত ভিজে চিরহরিৎ জঙ্গলে। দ্বিতীয় 'নারকনডাম হর্নবিল' (বা নারকনডামি)—নরকন-ডাম দ্বীপ (আন্দামান দ্বীপপুঞ্জে)। বর্তমানে এই প্রজাতি প্রায় লুপ্ত হওয়ার মুখে।

স্বভাব—ঝুঁটি ধনেশ খুব বড়ো দলে বাস করে। সংখ্যায় দেখা গেছে এই দল 40 থেকে 80-র। দল অনুপাতে হাঁকাহাঁকি খুবই অল্প। ভাঙ্গা গলার গম্ভীর 'ক কঃ' ডাক। আসামের পার্বত্যাঞ্চলে ঝুঁটি ধনেশের মাংস বিক্রি হয় ওষুধ হিসেবে।

প্রজননকাল মার্চ থেকে জুন। ডিম পাড়ে 2-3 টি সাদা। ডিমের মাপ—লম্বায় 1·95, চওড়ায় 1·5 ইঞ্চি (63×43·2 মিমি)।

8/1, ডঃ বীরেশ গুহ স্ট্রীট, কলি-17

* * * * * *

অদ্ভুত প্রাণী অপসাম

পথিক মণ্ডল

অপসাম নামে একরকমের মজার প্রাণীর নাম তোমরা শুনে থাকবে। এই প্রাণীরা আমেরিকার পূর্বদিকে পাহাড়ী এলাকায় বাস করে। এদের দেখতে অনেকটা বিড়ালের মতো। শরীরটা ছাই ছাই রঙের, তার ওপর হলদে ও খয়েরীর ছোপ আছে।

অপসামের মুখে তিন রকম দাঁত আছে। কোন কিছু কাটার জন্যে আছে ছুরির মতো দাঁত ফুটো করার জন্যে আছে ছুঁচোল দাঁত, আর চিবানোর জন্যে আছে চওড়া দাঁত। ওরা মাছ, মাংস, ডিম, ফলমূল, শাকসবজি এমনকি সাপ, ব্যাঙ, খরগোস, ইঁদুর, পোকামাকড় প্রায় সব কিছুই খায়।

এরা আবার খুব ভীতু ও বোকা। গাছের কোটরে অথবা পাহাড়ের ফাঁকফোকরে এরা সারাদিন ঘুমিয়ে কাটিয়ে দেয়। রাতে শিকারে বের হয় খাবারের জন্যে। অন্য জীবজন্তুর তুলনায় এদের জীবন ধারণের পদ্ধতি অনেক সহজ।

মা অপসামের বুকে পাতলা একটা চামড়ার থলি আছে। জন্মের পর মায়ের বুকের থলিতে এবং পিঠে এরা জীবনের অনেক দিন আরামে কাটিয়ে দেয়। যখন বড় হয়, তখন নিজেরাই মা বাবা বনে যায়। তখনও কিন্তু বাচ্চাদের পালন করার জন্যে কোন বাসা তারা তৈরী করে না। বাচ্চাদের খাওয়ানোর জন্যে আলাদা কোন পরিশ্রমও তাদের করতে হয় না। নিজেদের জন্যেও কোন বাসা করার দরকার

তাদের নেই। প্রকৃতির তৈরী কোটরে অথবা পাহাড়ের খাঁজেই এরা জীবনের সব দিন কাটিয়ে দেয়।

শীতকালে এদের কোন কাজ থাকে না। সেরেফ শরীরটাকে বলের মতো ভেলা পাকিয়ে এক লম্বা ঘুম মারে।

159 স্টেশন রোড ইস্ট, নিউব্যারাকপুর, 24 পরগনা।

পোর্টল্যাণ্ড সিমেণ্ট

প্রতাপ চট্টোপাধ্যায়

সিমেণ্ট কথাটির আভিধানিক অর্থ 'সংযোজক বস্তু', অর্থাৎ যা জোড়া লাগাবার কাজে ব্যবহৃত হয়। কিন্তু সিমেণ্ট বলতে আমরা বুঝি এক ধরনের ধূসর বর্ণের মিহি গুঁড়ো যা জলের সঙ্গে মেশালে ধীরে ধীরে শুকিয়ে পাথরের মতো শক্ত হয়ে যায়।

নিজস্ব এই ধর্মের জন্যে সিমেণ্ট আধুনিক সভ্যতার অত্যাবশ্যক অঙ্গ। আকাশচুম্বী অট্টালিকা থেকে শুরু করে যাবতীয় ব্রীজ, বাঁধ আর রাজপথ তৈরীর মূল উপাদান অবশ্যই এই সবুজ-ধূসর পদার্থ।

সিমেণ্ট কিন্তু শুধুমাত্র আধুনিক সভ্যতার সম্পত্তি নয়। সিমেণ্টের ব্যবহার প্রাগৈতিহাসিক। পিরামিড তৈরীর কাজে মিশরীরা এক ধরনের সিমেণ্ট ব্যবহার করত। আগ্নেয়গিরির লাভার সঙ্গে চুন মিশিয়ে আর এক ধরনের সিমেণ্ট তৈরী করে রচিত হয়েছিল গ্রীক ও রোমান সভ্যতার হর্ম্যরাজি। তখন আরও অনেক ধরনের প্রকৃতিজ পদার্থ পাওয়া যেত, যাদের গুণাগুণ সিমেণ্টের মতো।

আধুনিক সিমেণ্টে আবিষ্কর্তা হলেন ইংরেজ রাজমিস্ত্রী জোসেফ অ্যাস্পডিন। 1824 খৃষ্টাব্দে লিডসের এই রাজমিস্ত্রী চুনের সঙ্গে মাটি মিশ্রিত করে পুড়িয়ে এক ধরনের পদার্থ প্রস্তুত করলেন যা জলের সঙ্গে মিশিয়ে শুকালে পাথরের মতো শক্ত এক ধরনের পদার্থে পরিণত হয়। গুণাগুণে ওই পদার্থ পোর্টল্যাণ্ড দ্বীপে প্রাপ্তব্য এক ধরনের পাথরের সমগোত্রীয়। সেজন্যে বাড়ি তৈরীর ওই জনপ্রিয় পাথরের নামানুসারে অ্যাস্পডিন তাঁর নবাবিষ্কৃত পদার্থের নাম দেন 'পোর্টল্যাণ্ড সিমেণ্ট'।

পোর্টল্যাণ্ড সিমেণ্টের মোটামুটি উপকরণ হলো : CaO 50–60%, SiO_2 20–25%, Al_2O_3 5–10%, MgO 2–3%, Fe_2O_3 1–2% এবং SO_3 1–2%।

ভালো জাতের সিমেণ্টে সিলিকার পরিমাণ অ্যালুমিনার আড়াই থেকে চার গুণ এবং ক্যালসিয়াম অক্সাইডের পরিমাণ সিলিকন, অ্যালুমিনিয়াম এবং আয়রনের মিলিত অক্সাইডের দ্বিগুণ হওয়া অত্যাবশ্যক।

উৎপাদন : ভারতে সিমেণ্ট উৎপাদন শুরু হয় 1914 খৃষ্টাব্দে গুজরাটের পোরবন্দরস্থিত ইণ্ডিয়ান সিমেণ্ট কোম্পানীর দ্বারা। বর্তমানে ভারতে প্রতি বছরে আড়াই কোটি টন সিমেণ্ট উৎপন্ন হয়।

উৎপাদনের জন্যে চুনাপাথর ($CaCO_3$) এবং মাটি নির্দিষ্ট ভাগে মিশিয়ে উত্তমরূপে গুঁড়া করে সমসত্ত্ব করা হয়। তারপর মশলাটি হয় অল্প জল মিশিয়ে থকথকে করে, না হয় শুকনো অবস্থায় স্ক্রু বাহকের মাধ্যমে ভাঁটির মধ্যে ঢালা হয়। একদিকে ঢালকরা চোঙাকৃতি আনুভূমিক ভাঁটিটি সঙ্গে সঙ্গে অল্প অল্প করে ঘুরতে থাকে। ফলে আস্তে আস্তে সমস্ত মশলাটি সামনের দিকে এগিয়ে যায় এবং তাপের সংস্পর্শে আসে। ভাঁটিতে তাপ দেওয়ার জন্যে এক ধরনের মারুত প্রজ্জ্বালক ব্যবহার করা হয়। প্রজ্জ্বালকের ওপর থেকে কয়লার গুঁড়ো ঢালা হয় এবং একপাশ থেকে বাতাস ফুঁ দেওয়া হয়। ফলে কয়লার দহনজাত উত্তাপ বাতাসে বাহিত হয়ে প্রজ্জ্বালকের মুখ দিয়ে ভাঁটির মধ্যে প্রবেশ করে। মশলাটি যখন ভাঁটির নিচু প্রান্তে সর্বোত্তপ্ত অঞ্চলে আসে তখন চুনাপাথর ভেঙ্গে ক্যালসিয়াম অক্সাইডে পরিণত হয়। সঙ্গে সঙ্গে প্রায় 1400—1650°C তাপাংকে ওই ক্যালসিয়াম অক্সাইড সিলিকা ও অ্যালুমিনার সঙ্গে বিক্রিয়া করে দু ধরনের ক্যালসিয়াম সিলিকেট $3CaO.SiO_2$; $2CaO.SiO_2$ এবং দু ধরনের অ্যালুমিনেট $3CaO.Al_2O_3$; $2CaO.Al_2O_3$ উৎপাদন করে। মিশ্রিত দগ্ধ পদার্থটিকে সিমেণ্ট ক্লিংকার বলে। সিমেণ্ট ক্লিংকার ভাঁটির সংলগ্ন শীতক থেকে সবুজ ধূসর গোলারূপে বের হয়ে আসে।

ক্লিংকারের সঙ্গে শতকরা 2—3 ভাগ ওজনের জিপসাম ($CaSO_4 \cdot 2H_2O$) মিশিয়ে খুব মিহি করে গুঁড়িয়ে যে বস্তুটি পাওয়া যায় সেটি আমাদের চিরপরিচিত পোর্টল্যাণ্ড সিমেণ্ট।

ব্যবহার : সিমেণ্ট ইমারতী দ্রব্যের রাজা। বাড়ি তৈরির কাজে কোনও কোনও স্থলে বিকল্প হিসাবে চুন সুরকি ইত্যাদি ব্যবহার করা সম্ভব হলেও জলের তলায় গাঁথনির কাজে সিমেণ্টের কোনও বিকল্প নেই।

রসায়ন বিভাগ, বারাসাত গভঃ কলেজ, বারাসাত, 24-পরগনা।

রাশিচক্র ও নক্ষত্র

বিমান বসু

ক্রান্তিবৃত্ত কি সে বিষয় তোমাদের আগেই বলেছি। ক্রান্তিবৃত্তকে আমরা আকাশে সূর্যের চলনপথও বলতে পারি, যার ওপরে সূর্যকে প্রতিদিন প্রায় এক ডিগ্রী করে পশ্চিম থেকে পূবে সরে যেতে দেখা যায়। এইভাবে সরতে সরতে 365 দিনে, মানে ঠিক এক বছরে আবার আকাশের ঠিক একই জায়গায় ফিরে আসে। ক্রান্তিবৃত্তের দুপাশে, উত্তরে ও দক্ষিণে, প্রায় 9 ডিগ্রী পর্যন্ত প্রায় 18 ডিগ্রী চওড়া আকাশের এলাকাকেই বলা হয় রাশিচক্র। আকাশের 88টি তারামণ্ডলের মধ্যে 12টিকে (যাদের 'রাশি'ও বলা হয়) দেখা যায় ঐ রাশিচক্রের ওপর। বারোটি রাশির নাম হলো— মেষ, বৃষ, মিথুন, কর্কট, সিংহ, কন্যা, তুলা, বৃশ্চিক, ধনু, মকর, কুম্ভ ও মীন।

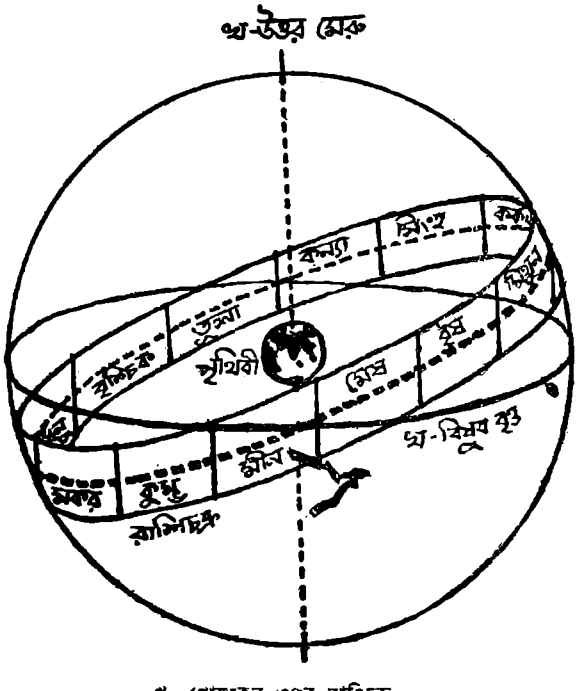

খ—গোলকের ওপর রাশিচক্র

প্রাচীনকালে মানুষের কাছে রাশিচক্রের তারামণ্ডলগুলি ছিল খুবই গুরুত্বপূর্ণ। কারণ সে সময় ঐ রাশিচক্রের ওপর চাঁদ সূর্য ইত্যাদির অবস্থানই ছিল মাস ঋতু বছর জানবার একমাত্র উপায়। আজও ঐ নিয়ম ক্যালেণ্ডার ও পঞ্জিকা তৈরীর কাজে ব্যবহার করা হয়।

দেখতে গেলে, রাশিচক্রকে আমরা খ-গোলকের ওপর বিশাল একটা ঘড়িও বলতে পারি, যাতে করে বছরের বিভিন্ন মাস ও ঋতুর হিসেব পাওয়া যায়। ঘড়ির ডায়ালে যেমন এক থেকে বারো পর্যন্ত সংখ্যা থাকে, ঠিক তেমনই রাশিচক্রের বারোটি রাশি হলো বছরের বারোটি মাসের নির্দেশক। অবশ্য এখানে ঘড়ির ডায়ালটা চ্যাপ্টা, গোলাকার নয়, বরং তার আকার হলো অনেকটা একটা চওড়া রেসলেটের মত।

সাধারণ ঘড়িতে সময় বোঝা যায় কাঁটা কোথায় আছে তা দেখে। রাশিচক্রের বেলায় সে কাজটা করে সূর্য। প্রতি মাসে সূর্য এক রাশি থেকে আর এক রাশিতে সরে যায়। ফলে কোন্ রাশিতে সূর্য আছে, তা দেখেই সেটা কোন্ মাস তা বলে দেওয়া যেতে পারে। যেমন ধরো, বৈশাখ মাসে সূর্য থাকে মেষ রাশিতে, জ্যৈষ্ঠ মাসে তাকে দেখা যায় বৃষ রাশিতে, আষাঢ় ও শ্রাবণ মাসে মিথুন ও কর্কটে। এইভাবে চলতে চলতে ফাল্গুন মাসে সূর্য গিয়ে পৌঁছয় কুম্ভ রাশিতে। চৈত্র মাসে তাকে দেখা যায় মীন রাশিতে। বৈশাখে সে আবার ফিরে আসে মেষ রাশিতে। এইভাবে চলতে থাকে বছরের পর বছর।

অবশ্য একটা কথা মনে রেখ। এই যে এক রাশি থেকে অন্য রাশিতে সূর্যের চলন, এটা কিন্তু কেবলমাত্র একটা প্রতীয়মান ঘটনা। আসলে সূর্যের চারপাশে পৃথিবীর ঘোরার দরুনই ওরকম মনে হয়। কেমন করে ওটা হয় ছবি দেখলেই বুঝতে পারবে।

তোমরা হয়তো ভাবছ যে, সূর্য কোন্ রাশিতে আছে তা দেখে বুঝবে কি করে। কারণ সূর্যের আলোয় তো আর আকাশে রাশি বা তারামণ্ডলকে দেখতে পাওয়া সম্ভব নয়। হ্যাঁ, কথাটা ঠিকই। কিন্তু একটা সোজা উপায় আছে। তোমরা নিশ্চয়ই জানো যে, পূর্ণিমার দিন চাঁদ থাকে সূর্যের ঠিক উল্টো দিকে, মানে সূর্য থেকে ঠিক 180 ডিগ্রী দূরে। এখন যদি পূর্ণিমার রাতে চাঁদ কোন্ রাশিতে আছে দেখে নেওয়া যায় তা হলে সূর্য সে সময় কোন্ রাশিতে আছে তা সহজেই বের করে করে নেওয়া যেতে পারে। কারণ যে রাশিতে চাঁদ আছে তার পরে সপ্তম রাশিতেই থাকবে সূর্য। যেমন ধরো, কোনও পূর্ণিমায় চাঁদকে দেখা গেল মকর রাশিতে, তা হলে বুঝে নিতে হবে যে সূর্য সে সময় রয়েছে কর্কট রাশিতে।

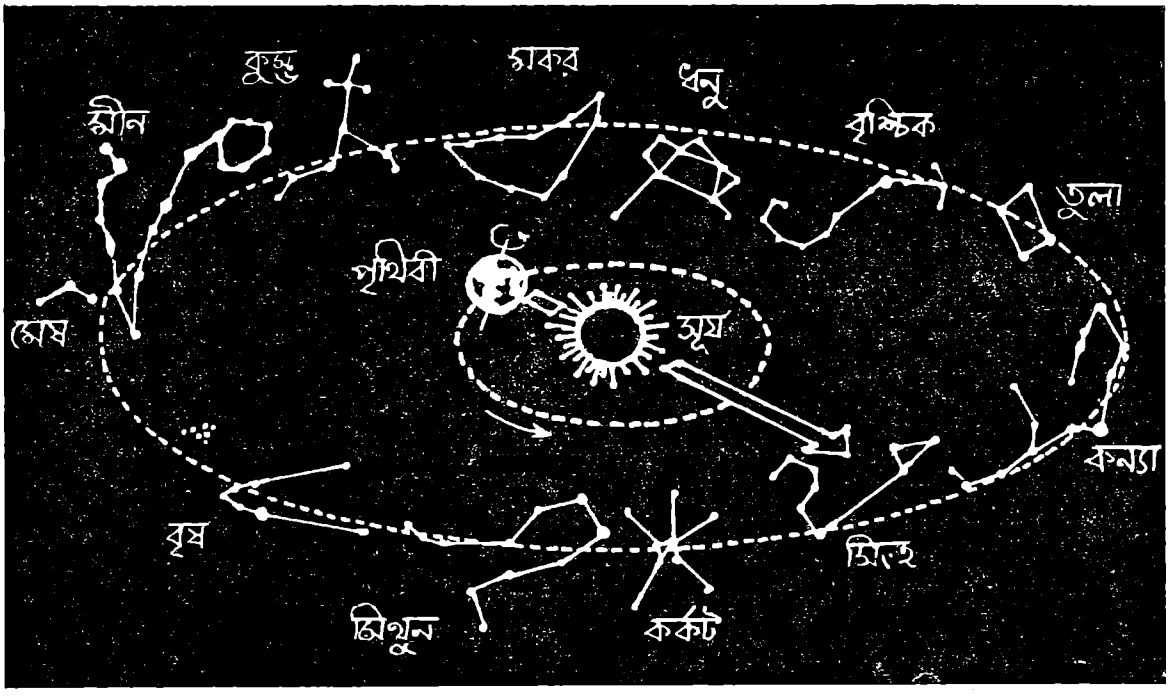

রাশিচক্রের রাশিগুলির মধ্য দিয়ে সূর্যের আপাত গতি

এর থেকেও সোজা একটা উপায় আছে, যাতে করে পূর্ণিমা পর্যন্ত অপেক্ষা না করেও বলে দেওয়া যেতে পারে সূর্য কোথায় আছে। তোমাদের আগে বলেছি যে, আকাশের প্রতিটি জ্যোতিষ্ক ও তারামণ্ডল প্রতিদিন একবার খ-মধ্যরেখাকে পূব থেকে পশ্চিমে পার করে যাকে বলা হয় মধ্যগমন। সূর্য মধ্যগমন করে ঠিক দুপুরে। সুতরাং সূর্যের ঠিক উল্টোদিকে রাশিচক্রে যে তারামণ্ডলটি আছে, মানে সূর্য যে রাশিতে আছে তার থেকে সপ্তম রাশিটি, মধ্যগমন করবে ঠিক মাঝ রাত্তিরে। মাঝ রাত্তিরে কোন্ রাশিটি মধ্যগমন করছে তা চিনে নেওয়া মোটেই কঠিন নয় (অবশ্য তার আগে রাশিচক্রের রাশিগুলিকে ভালভাবে চিনে নিতে হবে)। সুতরাং সূর্য কোন্ রাশিতে আছে সেটাও সহজে বের করে নেওয়া যেতে পারে।

রাশিচক্রের ওপর সূর্যের চলনের হিসেব রাখবার জন্যে বারোটি রাশিই যথেষ্ট। কারণ বারো মাসে সূর্য ঐ কটি রাশিই অতিক্রম করে। কিন্তু চাঁদের বেলায় হিসেবটা একটু জটিল। রাশিচক্রের ওপর চাঁদ প্রতি দিনে 13 ডিগ্রীর কিছু বেশি পশ্চিম থেকে পূবে সরে যায়। ফলে এক রাশি বা 30 ডিগ্রী অতিক্রম করতে তার লাগে প্রায় সোয়া দু'দিন। মানে, পুরো রাশিচক্রের বারোটি রাশি পেরিয়ে আসতে চাঁদের লাগে প্রায় 27 দিন 8 ঘণ্টা। এরকম একটা হিসেব রাখতে কত অসুবিধা তা বুঝতেই পারছ। এই অসুবিধা দূর করবার জন্যেই বোধ হয় প্রাচীনকালের বৈদিক হিন্দুরা রাশিচক্রকে 27টি অংশে ভাগ করেছিলেন, যাদের প্রত্যেকটিকে বলা হয় এক একটি 'নক্ষত্র'। প্রতিটি নক্ষত্রে চাঁদকে মাত্র এক দিন করে দেখা যায়। যেমন ধরো আজ যদি চাঁদকে দেখা যায় কৃত্তিকা নক্ষত্রে, তবে আগামীকাল সে থাকবে রোহিণী নক্ষত্রে, পরের দিন সে চলে যাবে মৃগশিরা নক্ষত্রে। এইভাবে চলতে চলতে $27\frac{1}{3}$ দিন পরে সে আবার ফিরে আসবে কৃত্তিকা নক্ষত্রে।

বলা হয় যে রাশিচক্রের 27টি নক্ষত্রের নাম রাখা হয়েছে 27টি উজ্জ্বল তারার নামে। আসলে কিন্তু সব কটি নক্ষত্রেই যে কোনও উজ্জ্বল তারা আছে তা নয়। বরং কয়েকটি নক্ষত্র এতই অনুজ্জ্বল যে শুধু চোখে তাদের চেনা বেশ কঠিন ব্যাপার। আধুনিক জ্যোতির্বিজ্ঞানে 'নক্ষত্র'গুলিকে চিহ্নিত করা হয় বিভিন্ন তারামণ্ডলের 27টি উজ্জ্বল ও অনুজ্জ্বল তারা দিয়ে। এদের বেশির ভাগই হলো রাশিচক্রের বাইরের তারামণ্ডলের তারা। তবুও সে

সব তারাদের যদি চিনে নিতে পারো তা হলে চাঁদের 'নক্ষত্র'-গুলিকেও সহজে চিনে নিতে পারবে।

নক্ষত্রের বিষয় একটা কথা তোমাদের বলা হয় নি। তা হলো এই যে, আমাদের ভারতীয় ক্যালেণ্ডারে মাসের নামগুলি, যেমন বৈশাখ, জ্যৈষ্ঠ, আষাঢ়, শ্রাবণ ইত্যাদি রাখা হয়েছে ঐ 27টির মধ্যে 12টি নক্ষত্রের নামানুসারে। হিসেবটা হলো এরকম। পূর্ণিমার দিন চাঁদ যে নক্ষত্রে থাকে সেই নক্ষত্রের নামানুসারেই মাসের নাম। যেমন ধরো, বৈশাখ মাসে পূর্ণিমার দিন চাঁদকে দেখা যায় বিশাখা নক্ষত্রে, জ্যৈষ্ঠ মাসে পূর্ণিমার দিন জ্যেষ্ঠা নক্ষত্রে। এই ভাবে শ্রাবণ মাসে শ্রবণা নক্ষত্রে, আশ্বিন মাসে অশ্বিনী নক্ষত্রে, কার্তিক মাসে কৃত্তিকা নক্ষত্রে, পৌষ মাসে পুষ্যা নক্ষত্রে পূর্ণিমার চাঁদকে দেখা যায়। অবশ্য এখানে আমরা মাস বলতে চান্দ্রমাসের কথাই বলছি, যাতে দিনের সংখ্যা হলো $29\frac{1}{2}$। সাধারণ ক্যালেণ্ডারের মাসের বেলায় ব্যাপারটা কিন্তু খাটে না।

রাশিচক্রের রাশি ও নক্ষত্রের বিষয় যে সব কথা বললাম তা থেকে বুঝতেই পারছ যে, আমাদের দৈনিক জীবনের সঙ্গে তাদের কত ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রয়েছে। আজও আমাদের দেশে পুজোপার্বণ ইত্যাদির তারিখ নির্ণয় করা হয় রাশিচক্রের ওপর চাঁদ ও সূর্যের অবস্থানের ভিত্তিতে। কিন্তু একটা কথা মনে রেখ। রাশি-নক্ষত্রের সঙ্গে কোনও দৈব ঘটনার সম্পর্ক নেই। আর কোন্ রাশিতে কোন্ গ্রহ আছে তার সঙ্গে মানুষের ভবিষ্যতের কোনও যোগাযোগ নেই। ওসব হলো কেবলমাত্র প্রাকৃতিক ঘটনা, যার ব্যাখ্যা আজ আমাদের কাছে আছে। আকাশের তারামণ্ডলগুলিকে যদি চিনে নিতে পারো, তা হলে বুঝতে পারবে সে সব ব্যাখ্যা কত সহজ।

7UF, কলেজ রোড, নয়া দিল্লী-1

প্রাণী-বিচিত্রা

বৌল চক্রবর্তী

সাপ তেড়ে আসছে?—আসুক না। বোর্নিওর একরকম উড়ুক্কু ব্যাঙ আছে তাদের ভয় নেই।

সে দম নিয়ে পেট ফুলিয়ে নিল তারপর ডানার মত চার পা মেলে, দিল এক লাফ। একেবারে শূন্য দিয়ে ভেসে অন্য গাছের ডালে। ওদের পায়ের পাতাগুলো অন্যরকম।

একটি গাছের আত্মকথা

প্রদীপকুমার ধর

আমি একটা বহু পুরনো গাছ। কিন্তু আমার হাবভাব আকার ইঙ্গিত মোটেই আমায় বৃদ্ধ বলে প্রতিপন্ন করে না। ও হ্যাঁ, আমার নামটাই বলা হয় নি, মোনোট্রোপা ইউনিফ্লোরা। অনেকেই বলে আমার নামটা নাকি বড়ই বিদ্‌ঘুটে। তোমরা তা হলে আমায় মোনোট্রোপা বলেই ডেকো, কেমন? টাইটেলটা না হয় বাদই দিলে, তাতে আমার তেমন কিছু আসে যায় না।

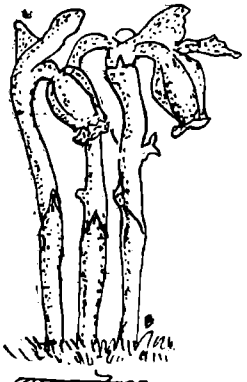

মোনোট্রোপা

আমার জীবনটা বড় দুঃখের! শুনলে তোমাদের কষ্ট হবে। আমার বড় ছেলে 'ক্লোরোফিল', ছোটবেলাতেই মারা গেছে। সে যদি আজ বেঁচে থাকত, তা হলে আমি কারও উপর নির্ভর করতাম না। এই বৃদ্ধ বয়সে সে আমায় নিশ্চয়ই ত্যাগ করত না। তা ছাড়া নিজের ছেলের উপর সব সময় জোর থাকে। ছেলে ক্লোরোফিল মারা যাবার পর একদল অনাথ বাচ্চাকে আমি মানুষ করলাম। তারা অবশ্য আমায় বড় ভালবাসে। তাদের সবাইকে আমি সমান চোখে দেখি, সমানভাবে আদরযত্ন করি। তাদের আমি নাম দিয়েছি 'ছত্রাক'। অনেকেই বলে—'আপনি ছেলেগুলোর একটা বাজে নাম দিয়েছেন।' আমি কিন্তু অনেক চিন্তাভাবনা করে তবেই ওদের 'ছত্রাক' বলে ডাকি। যেমন ধরো ওরা আমায় সব সময় ছাতার মতো আড়াল করে রাখে অভাবঅভিযোগ থেকে। ওরা আমায় কোন দিনই বাড়ির বাইরে যেতে দেয় না। বৃদ্ধ হয়েছি তো, পাছে কিছু অঘটন ঘটে। আমার মাটির তলার ঘর, যাকে তোমরা 'শিকড়' বল, তার বাইরের বারান্দায় ওরা থাকে। তাই খাওয়া-দাওয়া সব কিছুর জন্যেই ওদের উপর আমায় নির্ভরশীল থাকতে হয়। ওদের একটা বদ্‌গুণ আছে। ওরা পচা-মরা-আধমরা এই সব জিনিস খুব ভালবাসে। আর তাই আজকাল আমায়ও বাধ্য হয়েই সেই সব অখাদ্য-কুখাদ্য খেতে হচ্ছে। কি আর করব বল?

এই তো একদল বিজ্ঞানী এই বনে এসেছিল। হঠাৎ একজন বিজ্ঞানী আমায় দেখে বলল 'স্যার, একটা অজানা গাছ পেয়েছি।" তখন বড় বিজ্ঞানী ছুটে এসে বললেন—'It is nothing but a total saprophyte Monotropa Sp.' কিছু বুঝলাম না। শুধু এটুকু মনে হলো আমার নামেই যেন কিছু বললেন। বিজ্ঞানীটি একজন সুন্দর হাফ-বুড়ো টাইপের লোক, তিনি যে ইংরেজ বুঝতে দেরি হলো না। কথাবার্তা, হাবভাব, চালচলনেই বোঝা যায় বেশ জ্ঞানী ব্যক্তি। যাক, আগের ছোকরা বিজ্ঞানীটি এবার সব বুঝে ফেলেছে আমার সম্বন্ধে। তাই বন্ধুদের ডেকে বোঝাতে লাগল, 'জানিস, এই মোনোট্রোপা প্রজাতির প্রায় সবাই মৃতজীবী, মানে পচা-মরা জিনিস খায়। আর এদের শেকড়ে এক ধরনের ছত্রাক থাকে যারা এদের খাদ্য দ্রব্য যোগান দেয়। এই ছত্রাকেরা আবার এই গাছটির উপরও নানা দিক দিয়ে নির্ভরশীল। তাই এরা আবার মিথোজীবী।" শুনে আমার মাথাটা বোঁ বোঁ করে ঘুরতে লাগল 'মৃতজীবী মিথোজীবী'। তোমরা কিছু বুঝেছ?

286 সি. ডি. স্টেশন রোড, অণ্ডাল, বর্ধমান।

মাছের বিষ ও বিষাক্ত মাছ

সুধীন সেনগুপ্ত

মানব-ইতিহাসের শিশুকাল থেকে মাছ মানুষের দৈনন্দিন খাদ্যতালিকায় স্থান পেয়েছে। পৃথিবীতে এমন মানব-গোষ্ঠী বোধ হয় খুব কমই আছে যারা এই সহজ পাচ্য ও প্রয়োজনীয় প্রোটিনকে তাদের সাধারণ খাদ্যতালিকায় রাখেন নি। অল্প কিছু মাছ ছাড়া বেশির ভাগই সুস্বাদু। মাছের দেহে যে পরিমাণ প্রোটিন ও ফ্যাট বা স্নেহ জাতীয় পদার্থ থাকে তার প্রায় 97 শতাংশ প্রোটিন ও 95 শতাংশ ফ্যাট অতি সহজেই মানুষ হজম করতে পারে। এই সব কারণে মাছ খাওয়ার জনপ্রিয়তা আজ পৃথিবীব্যাপী। কিন্তু এই লোভনীয় খাদ্যবস্তুটি আবার অনেক সময় মানুষকে নানা বিপর্যয়ের মধ্যে ফেলে। মাছ খেয়ে মানুষের মৃত্যু বা গুরুতর অসুখের কথা মাঝে মাঝে শোনা যায়। এর প্রধান কারণ বিশেষ অবস্থায় মাছের দেহে নানারকম বিষাক্ত দ্রব্য তৈরি হয়। সমুদ্রের অনেক মাছ বিভিন্ন রকমের বিষাক্ত জলজ উদ্ভিদ প্রায়ই খেয়ে থাকে এবং এর ফলে তাদের দেহে বিষ তৈরি হয়। কিন্তু ওই সব মাছের তাতে কোনো ক্ষতি হয় না। কিন্তু ওই সব মাছ খেলে মানুষের বিষক্রিয়া হয়। এ রকমের বিষক্রিয়াকে cigvatera বলা হয় এবং প্রায় তিনশ প্রজাতির মাছ এর অন্তর্গত।

প্রজনন ঋতুতে অনেক মাছের জননকোষে রাসায়নিক পরিবর্তনের ফলে বিষ তৈরি হয়। জাপানের বিখ্যাত পাকার মাছ এর প্রকৃষ্ট উদাহরণ। বিভিন্ন রকমের শার্ক (হাঙর) ও রে (শঙ্কর) মাছের যকৃৎ খাওয়ায় মানুষের মৃত্যুর খবর মাঝে মাঝে পাওয়া যায়। এদের যকৃতে যেসব বিষ উৎপন্ন হয় তার রাসায়নিক বিশ্লেষণ এখনও হয় নি। এছাড়া আরও অনেক মাছের ত্বক, খাদ্যনালী, যকৃৎ ও জননকোষে নানারকমের বিষ তৈরি হয় যা মানুষের কাছে বিপদ্‌জনক।

টুনা, বনিটো, ম্যাকারেল ও স্কিপজ্যাক প্রভৃতি মাছ দু-তিন ঘণ্টা ঘরের সাধারণ উত্তাপে বা সূর্যের আলোতে রাখলে এক বিশেষ ধরনের ব্যাকটিরিয়া ওই সব মাছের দেহে অবস্থিত কোনো এক রাসায়নিক পদার্থকে পরিবর্তন করে হিসটামিন সাদৃশ্য সোপ তৈরী করে। ওই অবস্থায় এই সব মাছ খেলে মানুষের দেহে এলার্জিসদৃশ মারাত্মক উপসর্গ দেখা দেয় যা অনেক সময় মৃত্যুও ঘটায়।

আমাদের দেশের মেয়েদের কাছে মাছের ফুলকো একটা আকর্ষণীয় ও উত্তেজক খাদ্যবস্তু, কেননা ও বস্তুটিকে মুখে রেখে জীবনের পাওয়া না পাওয়ার গল্প অনেকক্ষণ ধরে করা যায়। কিন্তু সমুদ্র ও মিষ্টি জলের মাছ উভয়েই ফুলকোর সাহায্যে নাইট্রোজেনঘটিত বাহ্য পদার্থ, যেমন অ্যামোনিয়া ও ইউরিয়ার অনেকটাই ত্যাগ করে। তা ছাড়া জলবাহিত হয়ে নানা ধরনের জীবাণু ও বিষাক্ত পদার্থ ফুলকোর মধ্যে আটকে পড়ে। কাজেই ফুলকোর ছ্যাঁচড়া খাওয়ার অনেক বিপদ! এ ছাড়া মাছের খাদ্যনালীতে অন্য প্রাণীর পচা-গলা দেহাংশ থেকে আরম্ভ করে বহুরকম জৈব ও অজৈব বিষাক্ত পদার্থ প্রবেশ করে। অনেক হোটেল রেস্টুরেন্ট ও বিয়েবাড়িতে মাছের খাদ্যনালীকে ব্যবহার করা হয়, যা আমাদের মৃত্যুকে ত্বরান্বিত করতে সাহায্য করে।

আত্মরক্ষার প্রয়োজনে মাছের দেহে যে সব অস্ত্র তৈরি হয়েছে তার মধ্যে বিষগ্রন্থি ও বিষকাঁটা প্রধান। বিষগ্রন্থি সাধারণত এপিডারমাল কোষের রূপান্তরিত অংশ। আর মাছের পিঠের পাখনায় ও কানকোতে যে সব কাঁটা থাকে তাই পরিবর্তিত হয়ে বিষগ্রন্থির সঙ্গে যুক্ত হয়ে প্রয়োজনীয় অস্ত্র হিসাবে কাজ করে। তরুণাস্থিবিশিষ্ট মাছের মধ্যে স্প্রাইনি ডগ ফিস, বুল হেডেড শার্ক এবং শঙ্কর মাছের বিষগ্রন্থি ও কাঁটা বিশেষ উল্লেখযোগ্য। বুল হেডেড

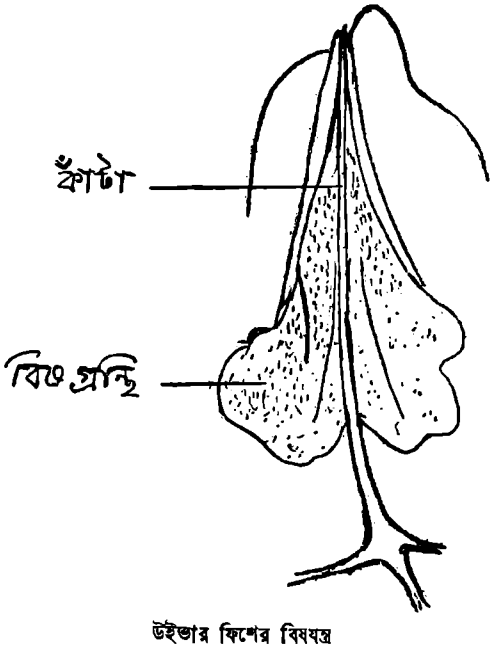

উইভার ফিশের বিষযন্ত্র

মাছের বিষকাঁটা অনেকটা করাতের মতো দেখতে। ওই কাঁটার দু পাশ দিয়ে দুটি খাত প্রসারিত হয়েছে। আর ওই খাতের চারপাশের কোষগুলি থেকেই বিষ তৈরি হয়। কাটার আঘাতে মানুষের শরীর কেটে গেলে বিষ ওই খাত বেয়ে দেহে প্রবেশ করে বেদনাদায়ক ও বিষাক্ত ঘায়ের সৃষ্টি করে। শঙ্কর মাছের লেজের গোড়ায় ছোরার মতো দেখতে কয়েকটি কাঁটা থাকে। প্রত্যেকটি কাঁটা বরাবর একটি খাত দেখা যায়। আর ওই কাঁটাকে ঘিরে এক সার কোষ থাকে যা থেকে বিষ তৈরি হয়। আবার অন্য কয়েকটি প্রজাতির শঙ্কর মাছে সমস্ত লেজ জুড়ে ছোট ছোট বিষাক্ত কাঁটা ছড়িয়ে থাকে। এদের বিষ মানুষের রক্ত সংবহনতন্ত্রকে আক্রমণ করে, যার ফলে শরীর ভীষণভাবে ফুলে ওঠে এবং মারাত্মক কাঁপুনি হতে দেখা যায়। শঙ্কর মাছের কাঁটার আঘাতে পেট বা বুক কেটে গেলে মানুষের মৃত্যুও হতে পারে।

অস্থিবিশিষ্ট প্রায় 40টি প্রজাতির মাছে বিষযন্ত্র পাওয়া যায়। এদের মধ্যে ক্যাট ফিশ (মাগুর, সিঙ্গি প্রভৃতি), স্করপিওন ফিশ, উইভার ও টোড ফিশের বিষ-গ্রন্থি ও বিষকাঁটা খুবই সাংঘাতিক। ক্যাট ফিশের পিঠের পাখনার প্রথম কাঁটা পরিবর্তিত হয়ে শক্ত ও চ্যাপটা আকার ধারণ করে। কোনো কোনো ক্যাট ফিশে ওই কাঁটার 5 দিকই করাতাকৃতি হয় এবং কাঁটার চারধারে যেসব এপিডারমান কোষ থাকে তা থেকেই বিষ তৈরি হয়। ক্যাট ফিশের কাঁটায় মানুষের দেহ কেটে গেলে বিষ ওই কাঁটা বেয়ে শরীরে প্রবেশ করে বিপজ্জনক ঘায়ের সৃষ্টি করে। উইভার মাছের বিষযন্ত্র আরও উন্নত। এদের কানকোর কাঁটা এবং পিঠের পাখনার পাঁচ-ছ'টা কাঁটা দেহের ভিতরে গিয়ে বিষগ্রন্থির সঙ্গে যুক্ত হয়। সামনের দিকের কিছু অংশ যা বাইরে বেরিয়ে থাকে, তাছাড়া কানকোর কাঁটার বাকি অংশ একটা পর্দা দিয়ে ঢাকা থাকে। এই কাঁটার দু পাশে 5টি খাত দেখা যায়। নাসপাতি আকারের বিষগ্রন্থিটা খাত বরাবর চলে দেহের ভেতরে কাঁটার গোড়ায় শেষ হয়। উইভার মাছের আঘাতে মানুষের শরীর কেটে গেলে বিষগ্রন্থি থেকে বিষ বার হয়ে খাতের মধ্যে দিয়ে ওই ক্ষতস্থানে প্রবেশ করে। এই বিষ মানুষের স্নায়ুতন্ত্র ও রক্তে বিষক্রিয়া সৃষ্টি করে। ফলে প্রথম আঘাতের জায়গায় জ্বালা আরম্ভ হয় যা কিছু পরে সারা দেহে ছড়িয়ে পড়ে। এ ছাড়া আক্রান্ত ব্যক্তির বমি ও জ্বর হয়ে থাকে। উইভার মাছের বিষের জ্বালা কখনো কখনো এত তীব্র হয় যে আক্রান্ত ব্যক্তি আত্মহত্যা করতে চায়। অনেক সময় হৃদপিণ্ডে বিষক্রিয়া ছড়িয়ে পড়ায় আক্রান্ত ব্যক্তির মৃত্যুও

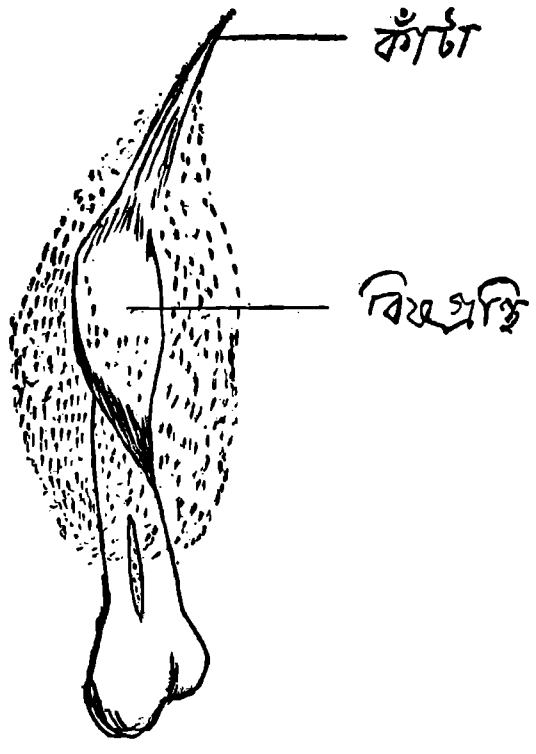

স্টোন ফিশের বিষযন্ত্র

হয়ে থাকে। সাপের বিষের সঙ্গে উইভার মাছের বিষের সাদৃশ্য থাকায় ফরাসীরা ওই মাছকে 'উইভার' অর্থাৎ 'ভাইপার' বলে থাকে।

স্টোন মাছের বিষযন্ত্র আরও উন্নত। এদের পিঠের কাঁটার তলায় বিষগ্রন্থি থাকে। এ গ্রন্থি থেকে একটা নল কাঁটার খাতের মধ্য দিয়ে প্রসারিত হয়েছে। সমুদ্রের তীরে বালির তলায় প্রায়ই স্টোন মাছ ঢুকে থাকে, কিন্তু ঐ কাঁটাটা বালির উপরে বেরিয়ে থাকে। খালি পায়ে সমুদ্র-তীরে চলাচলের সময় ওই কাঁটার উপর পা পড়লে তা ভেতরে ঢুকে যায় এবং নলের মধ্যে দিয়ে বিষও প্রবেশ করে। টোড মাছের কানকোর ও পিঠের পাখনার এক জোড়া কাঁটা রূপান্তরিত হয়ে ফাঁপা নলের মতো দেখতে হয় এবং এদের দুদিকই খোলা। দেহের ভেতরে কাঁটা-গুলি বিষগ্রন্থির সঙ্গে লেগে থাকে। এদের বিষ ঠিক ইনজেকশনের সূঁচের মতো দেহে প্রবেশ করে।

এখনও পর্যন্ত মাছের বিষের কোনো প্রতিষেধক বার হয় নি। তবে অনেক ক্ষেত্রে ঠাণ্ডা নুন জলে ক্ষতস্থান ধুয়ে ফেললে উপকার পাওয়া যায়।

ভারতীয় প্রাণিতত্ত্ব সমীক্ষা, ৪ লিণ্ডসে স্ট্রীট, কলি

মানুষের দেহ সুস্থ থাকে যতক্ষণ জীবনের সুখ ভোগ শুধু ততক্ষণ

সুস্বাস্থ্যই মানুষের প্রথম প্রয়োজন। এই উদ্দেশ্য সামনে রেখে পরিকল্পনা রূপায়ণকালে স্বাস্থ্যরক্ষার বিষয়টির প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখা হয়েছে।

- ২০০০ সালের মধ্যে "সকলের জন্য স্বাস্থ্য" বাস্তবায়িত করতে এক পরিকল্পনা রচনা করা হয়েছে।
- এর আগেই সারা দেশে প্রায় দেড় লক্ষ স্বাস্থ্য কর্মী নিয়োগ করা হয়েছে। তাছাড়া ৫৫ হাজারের উপর প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্র এবং উপকেন্দ্র খোলা হয়েছে।
- শিশু ও প্রসূতি মহিলারা সহজে রোগে আক্রান্ত হয়ে পড়েন। সেই কারণে শিশুদের স্বাস্থ্যরক্ষার জন্য এক সুসমন্বিত কার্যসূচী শুরু করা হয়েছে। এর সুফল লক্ষ্যগোচর হতে শুরু করেছে।
- বস্তির অপরিচ্ছন্ন ও অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে নানান রোগের উৎপত্তি হয়। এধরনের বস্তি এলাকায় বসবাসকারী তিন কোটির মত লোক ১৯৯০ সালের মধ্যে ২০ দফা কার্যসূচীর মাধ্যমে পরিচ্ছন্ন ও স্বাস্থ্যকর পরিবেশে বসবাস করতে সক্ষম হবেন।

সুস্থ নাগরিকই সুস্থ সমাজের বনিয়াদ

এবিষয়ে বিশদ জানতে হলে নীচের কূপনটি ব্যবহার করুন ঃ—

অ্যাসিস্ট্যাণ্ট ডিসট্রিবিউশন অফিসার
ডি. এ. ভি. পি.
৩৯ রবীন্দ্র সরণী
কলিকাতা-৭০০০৭৩

নতুন বিশদফা কার্যসূচী সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে চাই। অনুগ্রহ করে আমাকে ইংরাজী/বাংলা পুস্তিকা পাঠান।

নাম .....

ঠিকানা .....

..... পিন.....

নতুন ২০ বিশদফা কার্যসূচী

davp 83/85

আগস্ট '83 বিজ্ঞান-জিজ্ঞাসার দশ বা তার বেশি সঠিক উত্তরদাতাদের নাম

কলকাতা ঃ দিবেন্দু পাণিগ্রাহী, অমিতাভ অধিকারী, প্রাণপ্রকাশ মজুমদার, প্রণবকুমার সরকার, সুপর্ণা সরকার, রুমকি সরকার, বিশ্বজিৎ সরকার, অসিত দোয়ারি, মিঠু সেন, কাকলি কুণ্ডু, বুলু কুণ্ডু, তপন দাস, বৈদ্যনাথ ত্রিপাটি, সুব্রত ঘোষ, রবিব্রত ঘোষ, অতীন্দ্রনাথ মিশ্র, শুভেন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়।

24-পরগনা ঃ অর্ণব বন্দ্যোপাধ্যায়, সৌমিত্র প্রামাণিক, পঙ্কজ মণ্ডল, তমাল ঘটক, পূজন চক্রবর্তী, সুজিত মারিক। উৎপল বিশ্বাস, তৃপ্তি চৌধুরী, শ্যামসুন্দর চৌধুরী, সপ্তর্ষি মিত্র।

হাওড়া ঃ পার্থ দাস, কাঞ্চন কাঞ্জিলাল, তীর্থঙ্কর পাইন, অভিজিৎ সরকার, অজিৎ চট্টোপাধ্যায় ও অন্যান্য, সলিল পাল ও অন্যান্য, নিমাই সাউ, অসিত ও অমিতাভ রীত।

হুগলী ঃ সৌমেন বসু, নবীন মুখার্জী, সুপ্রিয় মোদক, মিনতি মোদক, পার্থ কুণ্ডু, শ্যামলকুমার মণ্ডল, রাজা কিলিকদার, শুভেন্দু খাঁ, আলপনা খাঁ, অভিজিৎ দত্ত, সনজিৎ দত্ত, যমুনা শীল, অনুসীমা শীল, আশিসকুমার সাহা, নিলয় মুখোপাধ্যায়, মলয়কৃষ্ণ রায়, পার্থ মুখার্জী, প্রবীর মুখার্জী, সমীর মুখার্জী, অজয় রায়চৌধুরী, দিবেন্দু কুণ্ডু, মঞ্জরী কুণ্ডু, রিনি কুণ্ডু, অনামিকা সাহা, দেবাশিস সাহা।

বর্ধমান ঃ তরুণকুমার সিংহ ও অন্যান্য, কাঞ্চন মুখার্জী, কৌশিকচন্দ্র কুণ্ডু, রবীনকুমার মণ্ডল, পার্থসারথি মুখোপাধ্যায়, সুরজিৎকুমার কুণ্ডু, কৃষ্ণগোপাল সেন, দেবাশিস সরকার, দেবলীনা সরকার, বিপ্লব সান্যাল, জহরলাল সিংহ, বিনয়কুমার দাস, নবকুমার মণ্ডল, অরিন্দম বাউরা, রূপা মুখোপাধ্যায়, সুলেখা মুখার্জী, সুবীর মুখার্জী, সুশান্ত মুখার্জী, অরুণা মুখার্জী, নিশার আকতার, ফাল্গুনী দাস, দুলাল ও শান্তা দে, মৃত্যুঞ্জয় পাল।

মেদিনীপুর ঃ রুমা মাইতি, স্বপন অধিকারী, কিংশুক হালদার, প্রভাতকুমার গিরি, সৌমেনকুমার গিরি, ধূর্জটিপ্রসাদ সাহু, শঙ্করপ্রসাদ অধিকারী, কমলেশ পাত্র, জয়ন্ত কর, কাকলী বেরা, মুকুলেশ পরিয়ারী, অরুপকুমার দাস, অজিতকুমার দত্ত, চন্দন দাস, কমলেশ পাত্র, জয়ন্ত কর, কাকলী বেরা, নমিতারাণী মাইতি, সন্ধ্যারাণী মণ্ডল, ননীগোপাল মণ্ডল, সুচিত্রারাণী কর।

নদীয়া ঃ প্রবীর চক্রবর্তী, শান্তনু চক্রবর্তী, সুবীর চক্রবর্তী, সুজিতকুমার খাঁ, পার্থপ্রতিম তরফদার।

মুর্শিদাবাদ ঃ চিন্ময় মুখোপাধ্যায় শুভাশিস মুখোপাধ্যায়, অভিজিৎ দে, অম্বুজপদ রাহা, মহঃ ইমদাদুল হগ, অরুণকুমার দে, দেবপ্রসাদ মাইতি, কাজি জ্যাকেরিয়া, মহীউদ্দিন, গোলাম মর্তুজা, পার্থপ্রতীম চট্টোপাধ্যায়, সুব্রত চ্যাটার্জী, বৈশালী চ্যাটার্জী, আবুল কালাম।

মালদহ ঃ অরুণকুমার বিশ্বাস।

জলপাইগুড়ি ঃ কল্যাণ দাস।

কোচবিহার ঃ দীপংকর মুখার্জী।

বীরভুম ঃ প্রিয়জ্যোতি ভট্টাচার্য্য, সৌরজ্যোতি ভট্টাচার্য, বামদেব সরখেল, দীপনারায়ণ দত্ত, সুমিত্তা গোরা, নীলকমল ব্যানার্জী।

বাঁকুড়া ঃ মৃণালকান্তি দাশ, বিধানচন্দ্র দাশ, সুচন্দ্রা আদক, সুরজিৎ পাণ্ডা, দীনবন্ধু মিশ্র, সদানন্দ সিংহ মহাপাত্র।

পুরুলিয়া ঃ সুমন ঘোষ, শৈবাল সরকার, সুমিত বিশ্বাস, জয়দীপ প্রামানিক, টুম্পা গাপুলী, অরুণ দাস।

উড়িষ্যা ঃ বণ্ডামুণ্ডা ॥ রানা কিলিকদার।

রাউরকেল্লা ঃ চঞ্চল ভট্টাচার্য।

আগস্ট সংখ্যায় 'জুন মাসের' বদলে 'জুলাই মাস' পড়তে হবে।

বামফ্রন্ট সরকার ব্যাপকভাবে শিক্ষা-সম্প্রসারণে সংকল্পবদ্ধ

শিক্ষা ব্যবস্থাকে ব্যাপকভাবে জনগণের মধ্যে প্রসারিত করা এবং শিক্ষার গণতন্ত্রীকরণের নীতিতে বামফ্রন্ট সরকার দৃঢ়প্রতিজ্ঞ।

পশ্চিমবঙ্গের ইতিহাসে শিক্ষাখাতে সর্বকালীন রেকর্ড পরিমাণ টাকা ব্যয় হবে এই বৎসর, প্রায় চারশ আঠার কোটি টাকা।

বামফ্রন্ট সরকার গত ৬ বৎসরে ৪,৬০০ প্রাথমিক ও ১৫০০ মাধ্যমিক বিদ্যালয় স্থাপন করেছেন। বাহাত্তর লক্ষ শিশু অর্থাৎ ছয় থেকে দশ বছর বয়সী শিশুদের তিরানব্বই শতাংশ প্রাথমিক বিদ্যালয়ে পড়াশুনা করছে। এছাড়া যেসব শিশুকে এখনও পর্যন্ত প্রথানুগ শিক্ষাব্যবস্থায় আনা যায় নি তাদের আংশিক সময়ের জন্য প্রথামুক্ত শিক্ষা প্রকল্পের সুযোগ দেওয়া হয়েছে। ১৯৮২-৮৩ সালে এক লক্ষ ষাট হাজার শিশুকে এই ব্যবস্থার মধ্যে আনা হয়েছে।

প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ছাব্বিশ লক্ষাধিক শিশুকে 'পুষ্টি কর্মসূচী'র আওতায় আনা হয়েছে। বয়স্ক শিক্ষার সুফল পাচ্ছেন চার লক্ষ মানুষ।

আদিবাসী শিশুদের জন্য চারশ পঁচাশিটি প্রাথমিক বিদ্যালয় খোলা হয়েছে। মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক স্তরের তিন লক্ষ আশি হাজার ছাত্র-ছাত্রী বিভিন্ন বৃত্তিদান প্রকল্পের সুবিধা পাচ্ছে।

নারী শিক্ষা এবং তফসিলী ও আদিবাসী অধ্যুষিত এলাকায় শিক্ষা বিস্তারের উপর জোর দেওয়া হয়েছে। কলেজীয় শিক্ষা প্রসারের মূল ঝোঁকও অব্যাহত রয়েছে।

রাজ্যের গ্রন্থাগারগুলিকে অর্থ ও প্রচুর পরিমাণে গ্রন্থ সরবরাহ করে গণশিক্ষার প্রসারে উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।

বামফ্রন্ট সরকার ব্যাপকভাবে শিক্ষা সম্প্রসারণে সংকল্পবদ্ধ।

পশ্চিমবঙ্গ সরকার

তথ্য ও সংস্কৃতি ৬২৬৪।৮৩

প্রশ্নোত্তর

শরীর-স্বাস্থ্য চিকিৎসা বিজ্ঞানের নানা প্রশ্ন

উত্তর দিচ্ছেন ডাঃ হেমেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

1. প্রশ্ন ঃ চোখে সাবান লাগলে জ্বালা করে, কিন্তু হাতে বা পায়ে সাবান ঘষলে জ্বালা করে না কেন?
অতনু সিনহা, রানাঘাট, নদীয়া।

উত্তর ঃ চোখের আবরণ আর হাত পায়ের আবরণ সম্পূর্ণ আলাদা। চোখের আবরণ শ্লৈষিক ঝিল্লি, খুবই স্পর্শকাতর। সাবান ক্ষারীয় পদার্থ, সেজন্যে জ্বালা করে। এ ছাড়া অচ্ছোদ পটলও অতিমাত্রায় স্পর্শকাতর, যে কোনো বাইরের পদার্থ লাগলেই কষ্ট হয়। অপর পক্ষে হাত পায়ের আবরণ ত্বক। ত্বক বিভিন্ন রকম ভৌত পদার্থ সহ্য করবার ক্ষমতা রাখে।

2. প্রশ্ন ঃ আমাদের দেহের পিত্তরস তিতা কেন?
পার্থ দাস, নেতাজী বিদ্যামন্দির, ঢেকিয়াজুলি, আসাম।

উত্তর ঃ মাছের পিত্তর স্বাদ নিয়েই বোধ হয় এই প্রশ্ন জেগেছে। মানুষের পিত্তের স্বাদ কেমন জানা নেই। সম্ভবত তিতাই হবে। পিত্তের মধ্যে পিত্ত লবণ, গ্লাই-কোকলেট, টরোকলেট, কিছু রঞ্জক পদার্থ ইত্যাদি আছে। তারই জন্যে পিত্তের স্বাদ তিতা।

3. প্রশ্ন ঃ মৃত শ্বেতকণিকার দেহাবশেষই পুঁজ, আবার শ্বেতকণিকার আয়ুষ্কাল 3-15 দিন। অতএব 15 দিন পর মৃত শ্বেতকণিকা দেহে পুঁজ সৃষ্টি করবে। কিন্তু তা হয় না কেন? তা হলে ফোড়া পেকে গেলে পুঁজ সৃষ্টি হয় কি করে?
সাধন চট্টোপাধ্যায়, গোলাহাট, বর্ধমান

উত্তর ঃ শ্বেতকণিকা ও লোহিত কণিকা দুটিই একটি নির্দিষ্ট সময়ে বিনষ্ট হয়ে যায়। এ হলো স্বাভাবিক মৃত্যু। শ্বেতকণিকা পুঁজ সৃষ্টি করে না। জীবাণুর আক্রমণে শরীরস্থ কোষকলায় প্রদাহ সৃষ্টি হয় এবং সেখানে অসংখ্য শ্বেতকণিকা সমবেত হয়ে জীবাণু-গুলির সঙ্গে যুদ্ধ করে। ঐ যুদ্ধের ফলে স্থানীয় কলা বিনষ্ট হয়। ঐ স্থানে ক্ষতিগ্রস্ত কলা, মৃত শ্বেতকণিকা ও জীবাণু এবং কলানিঃসৃত লসিকা ও প্লাজমা মিলিয়ে পুঁজের সৃষ্টি হয়।

4. প্রশ্ন ঃ আমাদের ঢেকুর ওঠে কেন?
কৌশিক দে গড় গড়িয়া, বাঁকুড়া।

উত্তর ঃ পাকস্থলীতে নানারকম খাদ্যদ্রব্য পরিপাকের জন্যে বিবিধ উৎসেচক, অম্লরসের প্রভৃতির সংস্পর্শে আসে। এগুলি জারিত হবার সময় কিছু গ্যাস উৎপন্ন হয়। যেহেতু পাকস্থলী কিছু খাড়াভাবে অবস্থিত, সে কারণে খাদ্যগুলি নিচের দিকে এবং গ্যাস পাকস্থলীর উপর দিকে ভেসে ওঠে। গ্যাসের পরিমাণ বেশি হলে তা ঢেকুর হয়ে বেরিয়ে আসে।

5. প্রশ্ন ঃ ঘামের ফলে মানুষের শরীর থেকে গন্ধ বের হয় কেন? এটা কি কোনো চর্মরোগ? এর প্রতিকার কি?
মহম্মদ ইয়াসিন আখতার, সিউড়ি, বীরভূম।

উত্তর ঃ ঘাম হলো এক প্রকার স্রাব যা ঘর্মগ্রন্থি থেকে নির্গত হয়। শরীরের নানা স্রাবের নানা প্রকার গন্ধ থাকে। ব্যক্তিবিশেষে এই গন্ধের তারতম্য হয়। এটি কোনো রোগ নয়। সুগন্ধী দ্রব্যের দ্বারা ঐ গন্ধ চাপা দেওয়া ছাড়া আর কোনো প্রতিকার নেই।

6. প্রশ্ন ঃ রাত্রে কথা বলতে থাকলে বা গল্প করলে ঘুম পায় না; কিন্তু পড়তে বসলে আমাদের ঘুম পায় কেন?
প্রীতিরঞ্জন মাইতি, বনমালী চট্টোপাধ্যায়, মেদিনীপুর

উত্তর ঃ ঘুম পাওয়াটা ক্লান্তি এবং মনের ভাবের উপর নির্ভর করে। পড়তে বসলে ঘুম পাওয়ায় ক্ষেত্রে ঐ দুটো কারণই থাকতে পারে।

7. প্রশ্ন ঃ মৃগী রোগাক্রান্ত ব্যক্তিকে চামড়ার জুতো শোঁকালে রোগী সুস্থ বোধ করে কেন?
স্বরূপ চট্টোপাধ্যায়, কলকাতা-54

উত্তর ঃ চামড়ার জুতো শোঁকালে মৃগী রোগী কখনই উপকার পাবে না। অবশ্য হিস্টিরিয়া রোগীকে যে কোনো ঝাঁঝালো গন্ধ শোঁকালে উপকার হতে পারে।

8. প্রশ্ন ঃ সদ্যজাত শিশু থেকে আরম্ভ করে 6/7 মাস পর্যন্ত শিশুদের হাতের পাতা বন্ধ অবস্থায় থাকে কেন? জোর করে খুলে দিলে পুনরায় বন্ধ হয় কেন?
কাজল গোস্বামী, নিউটাউন, কোচবিহার।

উত্তর ঃ শিশু মাতৃগর্ভে স্থানাভাবের দরুন বেশ কিছু দিন গুটিসুটি মেরে থাকে। ভূমিষ্ঠ হবার পরেও কিছু দিন ঐ অবস্থায় থাকে, তারপর ধীরে ধীরে সবই স্বাভাবিক হয়ে আসে। তিন চার মাসের মধ্যেই পাশ ফেরা, উপুড় হওয়া এবং হাতে জিনিস ধরতে অভ্যস্ত হয়।

এবং আমরা

'এসেছে বরষা, এসেছে নবীনা বরষা,
গগন ভরিয়া এসেছে ভুবনভরসা।
দুলিছে পবনে সনসন বনবীথিকা,
গীতিময় তরুলতিকা।'

মেদুর দিনের এই নিবিড় অন্তরঙ্গ ছবি এঁকেছেন রবীন্দ্রনাথ তাঁর কবিতায়।

কিন্তু বর্ষার অন্য ছবির সঙ্গেও তো আমরা পরিচিত। সে ছবি নিদারুণ যন্ত্রণার। অহর্নিশি সংগ্রামের। প্লাবন। ধ্বংসলীলা। আর বিচ্ছিন্ন যোগাযোগ। দিনরাত্রি যখন আমাদের স্বেদ ও শ্রমে একাকার। সুকঠিন দায়িত্বে আমাদের প্রতিটি মুহূর্ত অতন্দ্র।

তখন কৈশোরেই রক্তাক্ত আর এক কবির কথা আমাদের মনে পড়ে 'কবিতা তোমায় দিলাম আজকে ছুটি'

INDIAN RAILWAYS
EASTERN RAILWAY

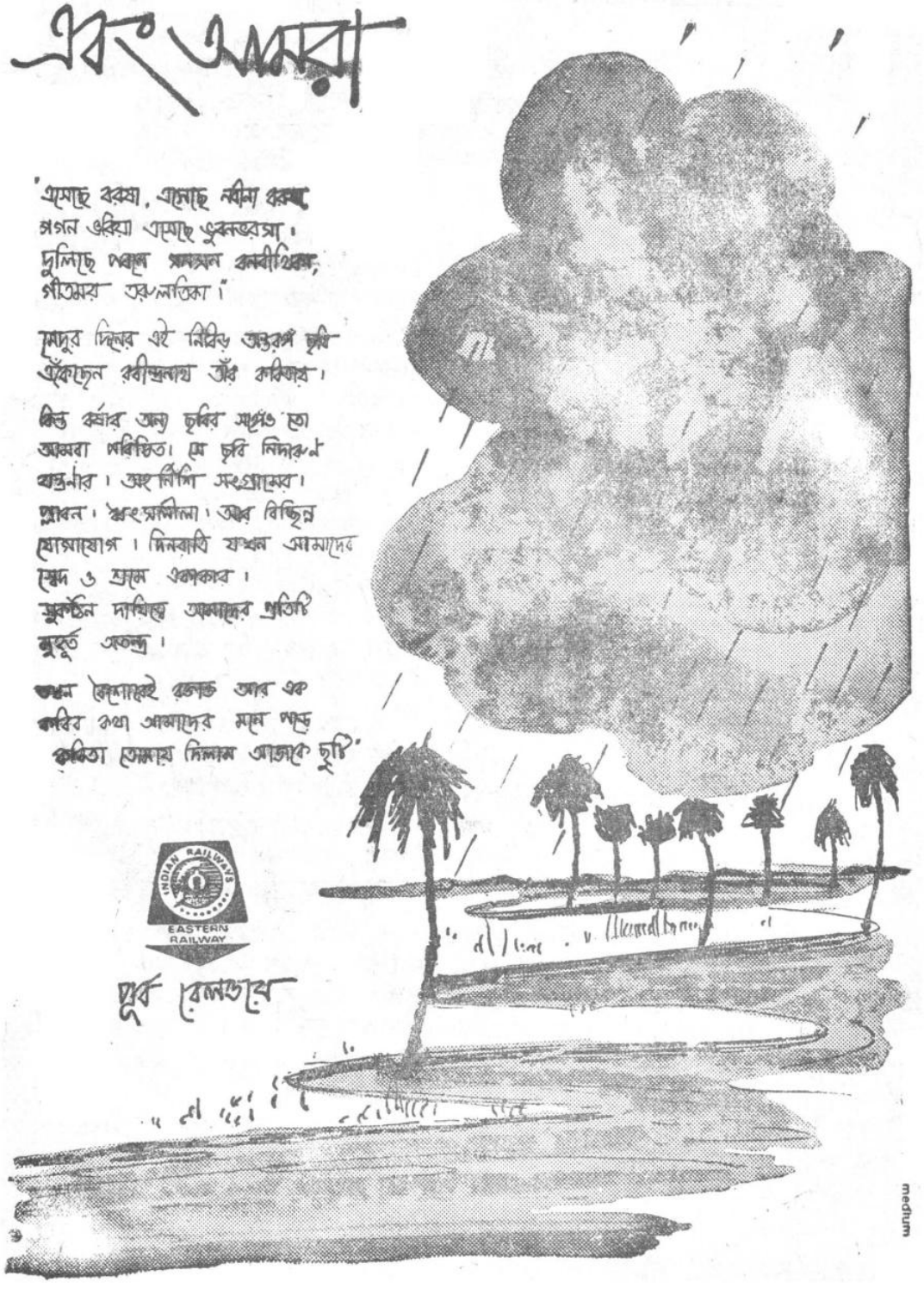

পূর্ব রেলওয়ে

medium

বিজ্ঞান জিজ্ঞাসা

অমরনাথ রায়

1. $C_{10}H_{16}O$ কিসের সংকেত ?
2. কত পাউণ্ডে এক টন হয় ?
3. এক গ্যালন বিশুদ্ধ জলের ওজন কত পাউণ্ড ?
4. ভূ-পৃষ্ঠের সবচেয়ে নিকটবর্তী বায়ুস্তরের নাম কি ?
5. প্রতি বর্গ ইঞ্চিতে বায়ুচাপ কত পাউণ্ড ?
6. কত ডিগ্রী সেলসিয়াস উষ্ণতায় জল স্টীমে পরিণত হয় ?
7. যে ব্যারোমিটারের সাহায্যে উচ্চতা মাপা হয়, তার নাম কি ?
8. 'অ্যাস্‌পিরিন'-এর আবিষ্কর্তার নাম কি ?
9. 'নারোরো' পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্রটি ভারতের কোন্ প্রদেশে অবস্থিত ?
10. শনিগ্রহ কত সময়ে নিজ অক্ষের চারপাশে একবার প্রদক্ষিণ করে ?
11. 1966 সালের মার্চ মাসে নীল আর্মস্ট্রং যে মহাকাশযানে চড়ে মহাকাশে পরিভ্রমণ করেছিলেন, তার নাম কি ?
12. অ্যাসিটিলিন-এর বিয়োজনে শব্দশক্তি কোন্ শক্তিতে রূপান্তরিত হয় ?
13. অশ্বশক্তি ও ওয়াট-এর মধ্যে সম্পর্ক কি ?
14. হল্যাণ্ডের জাতীয় ফুলের নাম কি ?
15. বিশ্বের ক্ষুদ্রাকার কুকুর কোন্‌টি ?

(উত্তর পরবর্তী সংখ্যায়)

গত সংখ্যার শব্দকূটের সমাধান

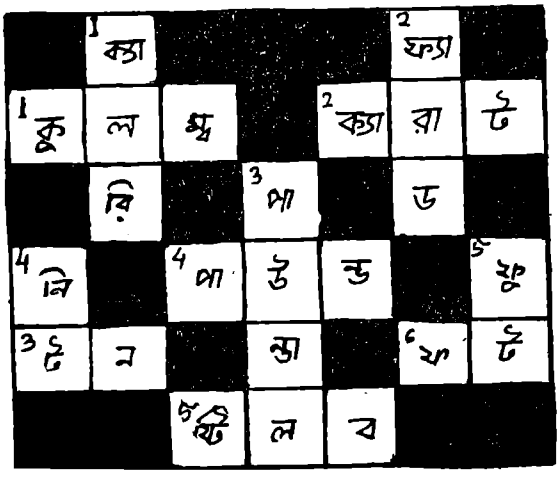

শব্দকূট/পারমিতা রায়

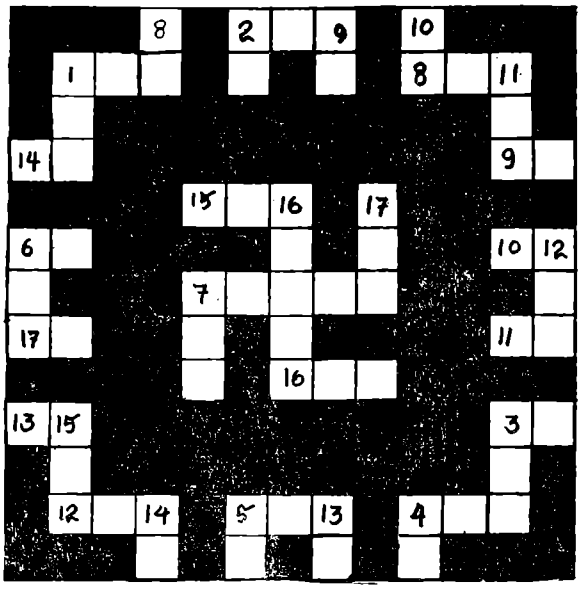

সংকেত—পাশাপাশি ঃ

1. অক্ষিপট। 2. রসায়নাগারে উদ্ভিদ হরমোন পরীক্ষায় ব্যবহৃত রাসায়নিক। 3. দর্শনেন্দ্রিয়। 4. পতঙ্গের জীবনচক্রের একটি দশা। 5. সন্ধিপদ পর্বভুক্ত পতঙ্গশ্রেণীর প্রাণী। 6. উদ্ভিদের রান্নাঘর। 7. সক্রিয় ক্লোরোফিল দ্বারা জল অণুর বিশ্লেষণ। 8. শস্যে খাদ্য সঞ্চয়কারী বীজ। 9. জীবজগতের শ্রেণীবিভাগের একটি পর্যায়। 10. প্রাথমিক জলচর প্রাণী।

সংকেত উপর-নীচ ঃ

9. স্তন্যপায়ীর কানের পাতা। 10. মেরুদণ্ডী প্রাণী দেহের তরল যোজক কলা। 11. উদ্ভিদের কাণ্ড, পাতা আছে, কিন্তু মূল নেই, জেটগতিসম্পন্ন মোলাস্কা পর্বভুক্ত প্রাণী। 12. ক্লোরোফিল বিহীন উদ্ভিদ। 13. শ্রবণেন্দ্রিয়। 14. মৎস্য ব্যতীত অন্যান্য মেরুদণ্ডীর আঙুলের অগ্রভাগ। 15. দেহের প্রতিটি কোষ পিত্তকারী তরল পদার্থ। 16. বিশেষ অভিযোজন ক্ষমতাসম্পন্ন সন্ধিপদ প্রাণী। 17. ক্ষুদ্রান্ত্রের শোষণ একক।

(গত সংখ্যার বিজ্ঞান জিজ্ঞাসার সমাধান)

1. তড়িৎপ্রবাহের দিক। 2. ভিটামিন-B। 3. ঋণাত্মক তড়িৎ। 4. লোহা ও সিলিকন। 5. ক্যারী পয়েণ্ট। 6. 1 মিলি মিটার। 7. চৌম্বক ক্ষেত্রে তারের ঘূর্ণন। 8. রূপার। 9. সীবেক ক্রিয়া। 10. পরমাণু ক্রমাঙ্ক কমে যাবে। 11. প্রোটন। 12. প্লাটিনামের। 13. লিভার। 14. কড্ মাছ। 15. যথাক্রমে 2 এবং 5টি।

নবম ও দশম শ্রেণীর রচনা প্রতিযোগিতায় পুরস্কারপ্রাপ্ত রচনা

রবার্ট ও হারা বার্ক

অমিতাভ চট্টোপাধ্যায় (প্রথম)

বার্ক (Robert O' Hara Bark, 1820-1860) আয়র্ল্যাণ্ডের অধিবাসী। তিনি সেনা বিভাগের ক্যাপ্টেন ছিলেন। কিন্তু সে পদে ইস্তফা দিয়ে তিনি মেলবোর্নের পুলিসম্যানের চাকুরি নেন। তিনি একদিন দলবল নিয়ে অভিযানে বেরিয়ে যান। তার সঙ্গী ছিলেন উইলিয়ামস্ জন উইলস্, গ্রে ও কিং। বার্ক অভিযানের জন্যে অষ্ট্রেলিয়ায় সর্ব প্রথম উট আমদানী করেন। ছটা উট, দুটো ঘোড়া ও ছ'মাসের খাদ্যসম্ভার নিয়ে তাঁরা যাত্রা শুরু করলেন। তিনি ব্রাহি নামে একটি লোককে তাঁদের জন্য তিন মাস অপেক্ষা করতে বলে যাত্রা শুরু করে দিলেন।

উত্তর দিকে চললেন তাঁরা চারজন—বার্ক, উইলস, গ্রে ও কিং। সামনে মরুভূমি ও পাথুরে জমি আর মধ্যে মধ্যে পাঁকে ভরা জলাভূমি। তার মধ্যে নেমে গেলে তল পাওয়া যায় না—সহজে ওঠবারও উপায় নেই। তাঁরা কার্পেন্টারিয়া উপসাগরের দিকে অগ্রসর হলেন। সমুদ্রে তাঁরা পৌঁছতে পারেন নি। ক্লিডাস নদীর মুখে জলপ্লাবনের মধ্যে পড়ে আর এগুতে পারলেন না। খাদ্য কমে যাওয়ায় তাঁরা ফিরে আসেন। খাদ্যাভাবে একটা উট মেরে তার মাংস এক মাস ধরে খেলেন। তারপর আবার একটা ঘোড়া মারলেন খাবার জন্যে। গ্রে মারা গেলেন। বাকী তিন জন কুপারস ক্রীকে কোন রকমে ফিরে এলেন।

তাঁরা একটা গাছের কাছে এসে দেখলেন, যে গাছের গায়ে খোদাই করা রয়েছে 'Dig' (অর্থাৎ এখানে খোড়)। ওঁরা খুঁড়ে কিছু খাদ্য পেলেন। তারপর খাদ্যাভাবে তাঁরা ওঁদের শেষ উটটিও খেয়ে ফেললেন। উইলস পীড়িত হয়ে পড়লে বার্ক ও কিং তাঁকে দিন আষ্টেকের খাদ্য পানীয় দিয়ে চলে যায়। বার্ক খোলা জায়গার কংকালসার হয়ে মারা যান। আদিম অধিবাসীরা কিংকে তাদের আস্তানায় নিয়ে গিয়ে সেবা শুশ্রূষা করে। পরে উদ্ধারকারী দল তাঁকে উদ্ধার করে। উইলস মারা যান। পরে উইলস-এর লেখা ডাইরি পাওয়া যায়। উদ্ধারকারী দল তাঁদের মৃতদেহ উদ্ধার করে অ্যাডিলেডে নিয়ে আসে। এই সব বীরদের চেষ্টায় অজানা অষ্ট্রেলিয়ার অনেক কথা লোকে জেনেছে। ইতিহাস তাঁদের ভুলবে না।

দশম শ্রেণী। কানাইলাল বিদ্যামন্দির, চন্দননগর, হুগলী।

বিরল প্রাণী

● রত্না তিয়াড়ী (দ্বিতীয়)

মানুষ আজ বিংশ শতাব্দীর বিজ্ঞানভিত্তিক যান্ত্রিক উৎকর্ষতার যুগে বসবাস করিতেছে। কিন্তু তাহারা ভুলিয়া গিয়াছে প্রকৃতির তথা সমগ্র জীবমণ্ডলীর নিয়ন্ত্রণকারী সেই প্রাকৃতিক ইকোসিস্টেমের কথা। কয়েক বৎসর পূর্বে মনুষ্যসমাজ অবাধে ধ্বংস করিয়াছে তথা নৃশংসভাবে হত্যা করিয়াছে প্রকৃতির সৌন্দর্যবাহী বন্য প্রাণীদের। ফলে আজ তাহারা বিরল প্রাণীরূপে পরিগণিত হইয়াছে।

বিরল প্রাণীদের মধ্যে সর্বাগ্রে মনে পড়ে সুন্দরবনের বিশ্ববিখ্যাত সেই রয়্যাল বেঙ্গল টাইগারের কথা, যাদের আজ স্বাভাবিকভাবে দেখা যায় না বললেই চলে। আজ থেকে প্রায় 70 বৎসর পূর্বে দেশের বিভিন্ন বনাঞ্চলে অসাধারণ সুন্দর ও শৌর্যবীর্যের প্রতীক যে বাঘের সংখ্যা ছিল প্রায় 400,000 এর অধিক। এখন সেই বাঘের সংখ্যা দাঁড়াইয়াছে 1900 এর মতো। ইহা ছাড়া ভারতের নীলগাই, কস্তুরীমৃগ, বাইসন প্রভৃতি বিলুপ্তির মুখে। এদেশে বিশেষ ভাবে গুজরাটের গীর অরণ্যে যে কয়েক হাজার সিংহ বসবাস করিত বর্তমানে সেই বনাঞ্চলে সিংহের সংখ্যা প্রায় 400, আর সমস্ত সিংহ প্রকৃতি থেকে লুপ্ত। কিছুমাত্র নিজেদের অবস্থা টিকাইয়া রাখিয়াছে। দেশের বিভিন্ন বনাঞ্চলের বৃহৎ ও ভয়ঙ্কর সর্পও আজ বিলুপ্তপ্রায়। চামড়ার উপর সাদা কাজ করা অতি চমৎকার চিতল হরিণের সংখ্যা উল্লেখযোগ্যভাবে কমিয়া গিয়াছে। নানা রঙের পেখম-যুক্ত ময়ূর আর পৃথিবীর বুকে দেখা যায় না বলিলেই চলে। এক কালে এশিয়ার যে দ্বি-শৃঙ্গ গণ্ডার ভারতে পাওয়া যাইত তা আজ কেবল সীমিত সংখ্যায় ব্রহ্মদেশ অঞ্চলে দেখা যায়। যে চিতা কয়েক বৎসর পূর্বে ভারত ও আফ্রিকার প্রায় সমস্ত স্থানে দেখা যাইত তা আজ কেবল সীমিত সংখ্যায় আফ্রিকায় নিজেদের অস্তিত্ব টিকাইয়া রাখিয়াছে। পৃথিবীর সমস্ত মহাসাগর হইতে জলের ঘোড়া রূপে পরিচিত নীল তিমি (Blue Whale) আজ বিরল। নিউজিল্যাণ্ড প্রভৃতি অঞ্চলের স্কেনোডেন, উল্লুক প্রাকৃতিক নির্বাচনে ক্রমশঃ বাদ পড়িতেছে। ভারতীয় বড় বাস্টার্ড ও সাদা ডানা হাঁস আজ বিলুপ্তপ্রায়। এই সমস্ত বিরল প্রাণীদের পৃথিবীর বুকে বাঁচাইয়া রাখার জন্য আজ গড়িয়া উঠিয়াছে সংরক্ষণ ব্যবস্থা, সৃষ্টি হইয়াছে বিশ্ব বন্য প্রাণী সংরক্ষণ সংস্থা (WWF) ও আরো নানা রকমের সরকার প্রচেষ্টা।

দশম শ্রেণী, নন্দীগ্রাম ব্রজেমোহন তিয়াড়ী বালিকা বিদ্যালয়

মহাকাশ গবেষণা

রামপ্রসাদ দাস (তৃতীয়)

মহাকাশ গবেষণা সম্বন্ধে আমরা যেটুকু জানছি তা সংহতির বাইরের সামান্য তথ্য ছাড়া আর কিছুই নয় এমনটা মনে করা ভুল হবে না।

গত দু'দশকে রাশিয়া ও আমেরিকা বৈজ্ঞানিক গবেষণা, কারিগরী পরীক্ষা, বায়ুমণ্ডল, আয়নমণ্ডল, চৌম্বকক্ষেত্র, ভ্যান অ্যালেন বলয়ের অস্তিত্ব, পৃথিবীর আকার, পৃথিবী ও মহাকাশের চাঁদের মধ্যে বিকিরণ ইত্যাদি প্রয়োজনীয় বিষয়ের সম্বন্ধে বিশেষ জ্ঞানলাভের জন্য কসমস, এক্সপ্লোরার, ডিসকভার পর্যায়ের উপগ্রহগুলো মহাকাশে পাঠিয়েছে। এছাড়া বাস্তব জীবনের প্রয়োজনে প্রায়োগিক উপগ্রহগুলো আকাশে তুলে নতুন শিল্পগত প্রক্রিয়া, সামগ্রিক দৃষ্টি, আবহাওয়ার পূর্বাভাস, যোগাযোগ স্থাপন, নৌকা-চলাচলের সুব্যবস্থা করে প্রাত্যহিক জীবনের ব্যাপ্তি ঘটিয়েছে।

মেরিনার, ভেনাস, ভাইকিং পর্যায়ের উপগ্রহগুলো শুক্র, মঙ্গল, বুধ সম্পর্কে অনেক তথ্য সরবরাহ করেছে। চুম্বকত্ব, উত্তাপ, মেঘ, বায়ুমণ্ডলের চাপ, বায়ুর বেগ, বায়ুর উপাদানের শতকরা ভাগ, গহ্বর, পাহাড়, বিশাল সমভূমি, নবীন-ধারাল পাথর, মেরুটুপীর প্রকৃত রহস্য সম্বন্ধে আমাদের জ্ঞানের সীমা অনেক বাড়িয়ে দিয়েছে। 1973 সালে বৃহস্পতি ও শনিকে পর্যবেক্ষণের জন্য পায়োনিয়ার-11 নামে যে উপগ্রহটি মহাকাশে তোলা হয়েছিল, সেটা তেমন গুরুত্বপূর্ণ তথ্য সরবরাহ করতে পারেনি।

এই উপগ্রহ ছাড়া সলিয়ুৎ ও স্কাইল্যাব স্পেশস্টেশনের সাহায্যে নানা পরীক্ষা চালিয়ে পৃথিবীর জলজ সম্পদ, খনিজ সম্পদ, কৃষি-ফসল, অরণ্য সম্পদ, ভূ-বিন্যাস, উপকূলরেখা ইত্যাদি বিশেষভাবে পর্যবেক্ষণ করে পৃথিবীর মানুষকে পূর্বাভাস দিয়ে অনেক ক্ষতির হাত থেকে রক্ষা করেছে। এই পর্যায়ের উপগ্রহগুলোর মধ্যে টাইরস, টেলেস্টার রিলে, সিনকোস, আর্লি বার্ড প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। এছাড়া দুঃসাহসিক মহাকাশ বিজয়ীদের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার গবেষণার জন্য এক গুরুত্বপূর্ণ সহায়ক হয়েছে।

ভারত রাশিয়া ও আমেরিকার আর্থিক ও কারিগরী সাহায্যে আর্যভট, ভাস্কর প্রভৃতি উপগ্রহ পাঠিয়েছে মহাকাশে। আজ পর্যন্ত যে 7টি দেশ মহাকাশে উপগ্রহ পাঠিয়েছে ভারত তাদের একটা। সংগুপ্তির প্রয়োজনীয় আচরণটা ঢেকে আন্তর্জাতিক সাহায্যের হাত বর্ধিত হলে মহাকাশ বিজ্ঞান আরো উন্নত হবে। বস্তুতঃ সংগুপ্তি ও বিজ্ঞান পরস্পর বিরোধী। আর এইজন্য বর্তমানে মহাকাশে স্পেশস্টেশনের মহড়া অনেক দেশকে চিন্তিত করে তুলেছে। বিরাট সমরাভিযানের পদক্ষেপ যদি এই গবেষণা নেয়, তবে বিশ্বের শান্তি ও সৌভ্রাতৃত্ব বিঘ্নিত হবে নিশ্চিত রূপে।

নবম শ্রেণী। মাটিয়ারী আর. পি. সেন বিদ্যালয়।

জানা-অজানা

হিমাদ্রিশেখর আদিত্য চৌধুরী

বৃষ্টি ঘটানোর নতুন উপায়ঃ—

1982 সাল গেল 'খরা' হিসাবে। বৃষ্টির অভাবে বহু ভাল ভাল জমি অনাবাদী হচ্ছে তার খবর অনেকেই রাখে না। তবে জাপানে এখনি বৃষ্টিপাত ঘটানোর উপায় বার করে ফেলেছে। জাপানের টয়ো-করো সংস্থা জলদ মেঘকে ভেঙ্গে বৃষ্টিপাত ঘটাতে সক্ষম হয়েছেন। এই উপায়ের মধ্যমণি একটা প্ল্যাস্টিকের পাহাড়। শক্ত কাচের আঁশ দিয়ে গঠিত এই পাহাড় আর চারদিক রেলন ফিলম দিয়ে মোড়া। পাহাড়টি 10 কিমি লম্বা, 1·2 কিমি চওড়া ও 600 মিটার উচ্চ। জাপানী বিজ্ঞানীরা দেখেছেন এই পাহাড় মেঘ ফাটিয়ে বৃষ্টি নামাতে পারে।

মাছের সাক্ষাৎকার ঃ—

কখনো কেউ শুনেছে মাছের সাক্ষাৎকার নেওয়া হচ্ছে? তাও সম্ভব হয়েছে। সেই দেশের নাম রাশিয়া। রাশিয়ার বড় বড় বিজ্ঞানীরা প্রায় তিন হাজার মাছের গলা টেপ করে রেখেছেন। এই সাক্ষাৎকার ঘটিয়েছেন বিজ্ঞানীরা হাইড্রোফোনের মাধ্যমে। যদি তুমি কখনো হাইড্রোফোন বিশেষজ্ঞকে জিজ্ঞাসা কর, কোন্ জায়গায় কোন মাছ থাকে, তাহলে তাঁরা অবলীলাক্রমে বলে দেবেন।

অবিশ্বাস্য ঃ—

সমুদ্র এক বিরাট খাদ্য যোগানদার। স্থলভাগে উৎপন্ন খাদ্যের বহুগুণ বেশি খাদ্য যোগায় সমুদ্র। ষাটের দশকের শেষভাগে সমুদ্র থেকে উৎপন্ন খাদ্যের পরিমাণ ছিল সাড়ে পাঁচশ লক্ষ মেট্রিক টন। যার মধ্যে ছিল বিশ্বের জান্তব প্রোটিনের একদশমাংশ। আর এই খাদ্য থেকে আয় হয়েছিল 80 হাজার কোটি আমেরিকান ডলার।

5C, এন. এস. এস, কল্যাণী, নদীয়া।

হাতখরচের টাকা ইউকোব্যাঙ্কে জমিয়েই আমি এই সাইকেল কিনেছি

বন্ধুর কাছ থেকে ধার করা
সাইকেল নয়।
এটা আমার নিজেরই।
সাইকেল কেনার জন্য টাকা জমাচ্ছি
যখন, বাবা বললেন, ইউকোব্যাঙ্কে জমাও
টাকা বেড়ে যাবে তাড়াতাড়ি।
তাই করলাম।
নিজের টাকা, সুদের টাকা।
বেশিদিন লাগে নি। নিজের সাইকেলে
চড়া, বড়ো আরাম।

ইউনাইটেড কমার্শিয়াল ব্যাঙ্ক

ইউকোব্যাঙ্ক কাছেই আছে,
ইউকোব্যাঙ্কে টাকা জমান

UCO/CAS-1/88/82 BEN

মডেল ঃ রোলিং প্রেস ● জ্যোতিষ সরকার

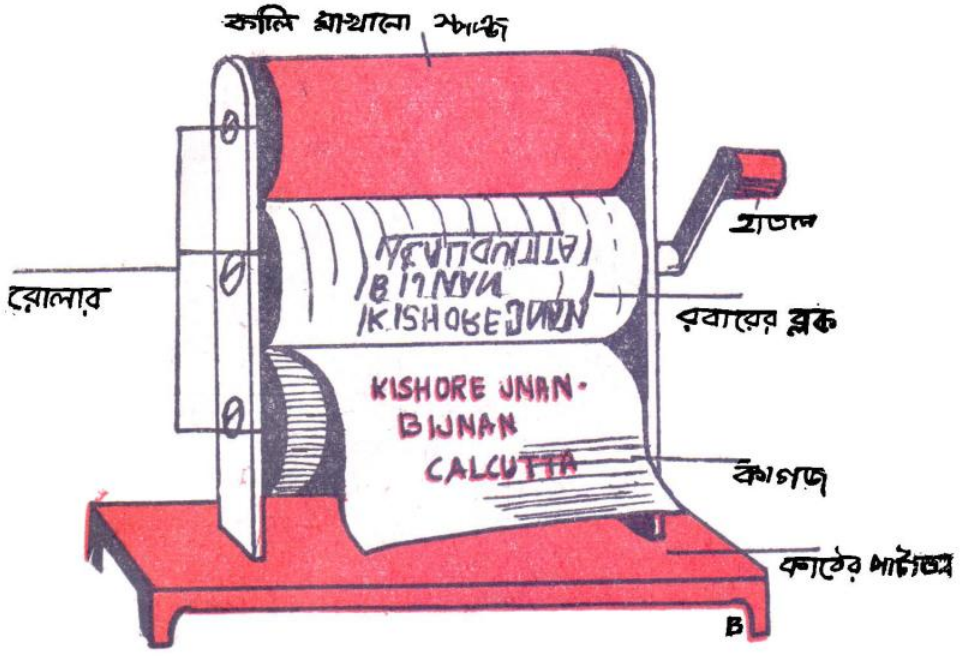

একটা সুন্দর হাতে তৈরী প্রেস তৈরী করতে যা যা প্রয়োজন সেগুলি বলছি। 1) তিনটি কাঠের রোলার—একটির ব্যাস $2\frac{1}{2}$ইঞ্চি, অপর দুটির $1\frac{1}{2}-2$ইঞ্চি; প্রত্যেকটিই প্রায় 5 ইঞ্চি করে হবে। (2) দুটো পাতলা স্পঞ্জের টুকরো—$5\times6\frac{1}{2}$ ইঞ্চি সাইজের (3) 8×5 ইঞ্চি সাইজের কাঠের পাটাতন, তার ওপরে কাঠের দুটো স্ট্যাণ্ড আনুমানিক $1\frac{1}{2}$ ইঞ্চি দূরত্বে লম্বভাবে আটকানো থাকবে। (4) একটি হাতল যেটা বড়ো রোলারটি সঙ্গে আটকিয়ে ঘোরানো যায়। (5) রবারের ইংরেজী ব্লক বা অক্ষর যারা রবারের 'সিল' তৈরী করে, তাদের দোকানে বলে আলাদা আলাদা কয়েক সেট ব্লক জোগাড় করবে। (6) ছাপার কালি যদি না পাও তবে আর্টপেনে যে কালি ব্যবহার করে সেটা হলেও চলবে। (7) স্পিরিট গাম।

এবার তৈরী করতে শুরু কর। অপেক্ষাকৃত সরু কাঠের রোলার দুটোতে স্পঞ্জের টুকরো দুটো জড়াও—দেখবে যেন না খুলে আসে। দরকার হ'লে ছোট পেরেক দিয়ে আটকে দিও। রোলার দুটি এবার কাঠের পাটাতনের সঙ্গে আটকানো স্ট্যাণ্ড দুটির মাঝখানে বসাও। আর মোটা রোলারটি রাখবে এদের মাঝখানে। পরস্পরের মধ্যে দূরত্ব খুবই সামান্য হবে। যে হাতলটার কথা বলেছি সেটা বড়ো রোলারটি সঙ্গে আটকানো থাকবে এবং হাতল ঘুরিয়ে রোলারটিও ঘোরানো যাবে রোলার তিনটি স্ট্যাণ্ডের সঙ্গে এমন ভাবে লাগাবে যেন তিনটিই পরস্পর আনুভূমিক ও সমান্তরাল থেকে স্বচ্ছন্দে ঘুরতে পারে।

এবার তুমি যা ছাপাবে সেটা একটা কাগজে লিখে ফেলো, আবার সমস্ত লেখাটা অন্য জায়গায় উল্টোভাবে লেখ। অর্থাৎ মনে কর শব্দটা CALCUTTA, প্রেসে ছাপানোর জন্য লিখবে ATTUCLAC এবার নিশ্চই বুঝলে। বেশ এখন সবার উপরে যে স্পঞ্জ জড়ানো রোলারটি আছে তাতে কালি মাখাও—সব জায়গায় সমান ভাবে দেবে। এটা করার আগেই কিন্তু ব্লকগুলি স্পিরিট গাম দিয়ে মধ্যের রোলারের গায়ে আটকিয়ে নেবে। সব তৈরী। এবারে দেখবে আগে প্রত্যেকটি রোলারের মধ্যে যে সামান্য ফাঁক ছিল, ব্লকগুলি বসানোর ফলে আর নেই।

নিচের রোলার দুটির অর্থাৎ মধ্যেরটি ও সবচেয়ে নিচের রোলারটির মধ্যে একটুকরো সাদা কাগজের এক প্রান্ত ঢুকিয়ে দাও। এবার হাতল দিয়ে বড়ো রোলারটি ঘোরাতে থাকো, দেখবে কাগজটি আপনা আপনি বেরিয়ে আসছে। প্রথম কাগজটিতে কিন্তু ছাপানো লেখা হবে না, এর কারণ মধ্যের রোলারটি অন্ততঃ আধবার না ঘুরতে পেলে কালি মাখানো ব্লক কাগজে পড়ে না। তাই দ্বিতীয় বারে যে কাগজটি দেবে তাতে সুন্দর ছাপা হয়ে অপর দিক দিয়ে বেরিয়ে আসবে।

এই ধরনের প্রেসের মডেলে সুবিধে হ'ল তুমি যা ইচ্ছে সেই মতো অক্ষরগুলো আটকে নিয়ে ছাপতে পার।

টোয়েন্টি থাউজেণ্ড লীগস্ আণ্ডার দি সী / লেখা ও ছবি : গৌতম কর্মকার

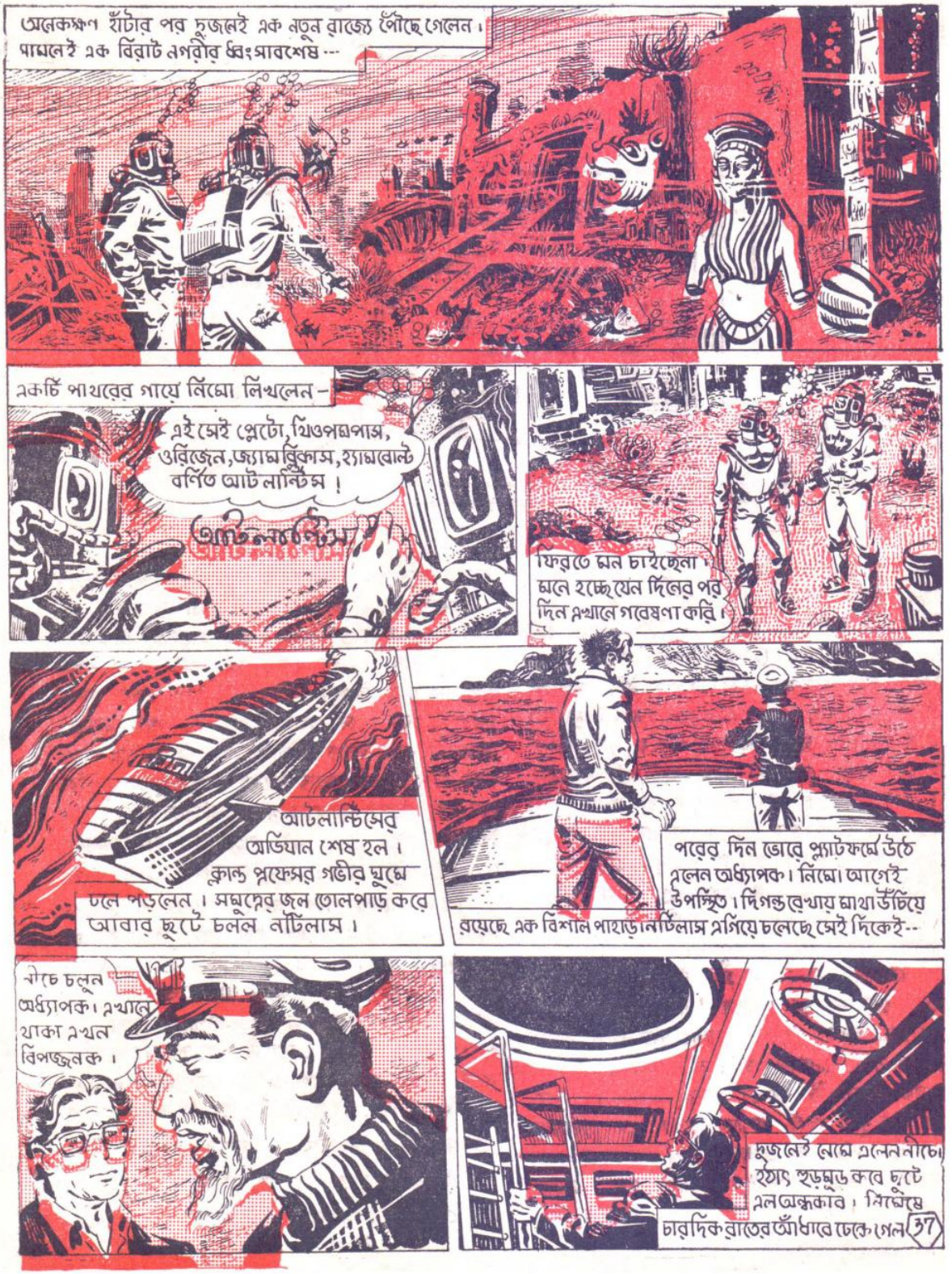

নটিলাসের আলোগুলো জ্বলে উঠল ।
আমরা এখন কোথায় ক্যাপ্টেন?
এক মৃত আগ্নেয়গিরির মধ্যে। সমুদ্রের জল এর মধ্যে ঢুকে আমাদের এক সুন্দর পোতাশ্রয় তৈরী করে দিয়েছে।
কিন্তু নটিলাসের কি কোন আশ্রয় প্রয়োজন ক্যাপ্টেন?
না, তা নেই। তবে আমার দরকার জ্বালানী। এই মৃত আগ্নেয়গিরির ভিতর থেকে আমি সংগ্রহ করি কয়লা ।
আগ্নেয়গিরির গর্ভে কাটল একটা দিন। তারপর নিমো নটিলাসকে আবার নিয়ে এলেন অতলান্তিক মহাসাগরে। এবার যাত্রা শুরু হল দক্ষিণ দিকে।
নটিলাস এগিয়ে চলেছে দক্ষিণে, আরও দক্ষিণে---
এভাবে চলতে থাকলে আমরা তো মেরুপ্রদেশে পৌঁছে যাব! তবে কি আর কোনদিনই বাড়ী ফিরতে পারব না?
বন্দী দশার জীবন সব থেকে বিরক্তিকর হয়ে উঠল নেডের।
হায় অতীত, তুমি কেন এত পীড়া দাও? মনে রেখ আমি আগের জীবনে ফেরার জন্যে শেষ রক্তবিন্দু দিয়ে লড়ব।
কয়েকদিন পর দিকচক্রবালে দেখা গেল এক দল তিমি।
ইশ, আমি অসহায় জেনেও ওরা আমাকে ক্ষেপাচ্ছে!
38

হাবুলের বিজ্ঞান-ভাবনা

ধীরেন বল

জ্ঞান ও আনন্দের আশ্চর্য সমীকরণ

শারদীয়

কিশোর জ্ঞান-বিজ্ঞান

এবারেও সেরা ১৯৮৩

বিষয় ও লেখক সূচী

বৈজ্ঞানিক ও ভৌগোলিক অভিধান

সুধাংশু পাত্র ॥ রথীন সরকার

বনভূমি ও গাছপালা

তারকমোহন দাস ॥ কৃষ্ণচন্দ্র রায়চৌধুরী

আবিষ্কারের গল্প

মনীশ প্রধান ॥ সুনীল সরকার

পশুপাখী ও কীটপতঙ্গ

অজয় হোম ॥ অমরনাথ রায় ॥ ক্ষেত্রপ্রসাদ সেনশর্মা ॥ মৃত্যুঞ্জয়প্রসাদ গুহ

নির্বাচিত প্রবন্ধ : প্রাচীন পৃথিবী

রমাতোষ সরকার ॥ দিলীপ বন্দ্যোপাধ্যায় ॥ জগদীশচন্দ্র ভট্টাচার্য ॥ প্রসাদকুমার দাস ॥ প্রতাপ কুমার দত্ত ॥ প্রসিত রায়চৌধুরী

ডঃ জয়ন্তবিষ্ণু নারলিকার : জানা-অজানার সীমানা

বিবিধ প্রবন্ধ

সূর্যেন্দুবিকাশ করমহাপাত্র ॥ জয়ন্ত বসু ॥ অনাদিনাথ দাঁ ॥ সুজিৎ সেনগুপ্ত ॥ সুনীত রায় ॥ সন্তোষ চট্টোপাধ্যায় ॥ শুভব্রত রায়চৌধুরী ॥ দিলীপ মালাকার ও আরো অনেকে

ছড়া

অন্নদাশঙ্কর রায় ॥ নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী ॥ অমিতাভ চৌধুরী ॥ দক্ষিণারঞ্জন বসু ॥ কৃষ্ণ ধর ॥ রঞ্জন ভাদুড়ী ॥ রেবন্ত গোস্বামী ॥ কবিতা সিংহ ॥ দাউদ হায়দার ॥ অনিল কর্মকার ॥ বরেন গঙ্গো ॥ রবীন সুর ॥ প্রবীর বন্দ্যোপাধ্যায় ॥ ঊষাপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায় ॥ রাখাল বিশ্বাস ও আরও অনেকে

সিদ্ধার্থ ঘোষ : থটরীডিং কার্ড

অমরনাথ রায় : সুপার ক্যুইজ কনটেস্ট ও পুরস্কার

ও আরও অজস্র আকর্ষণ

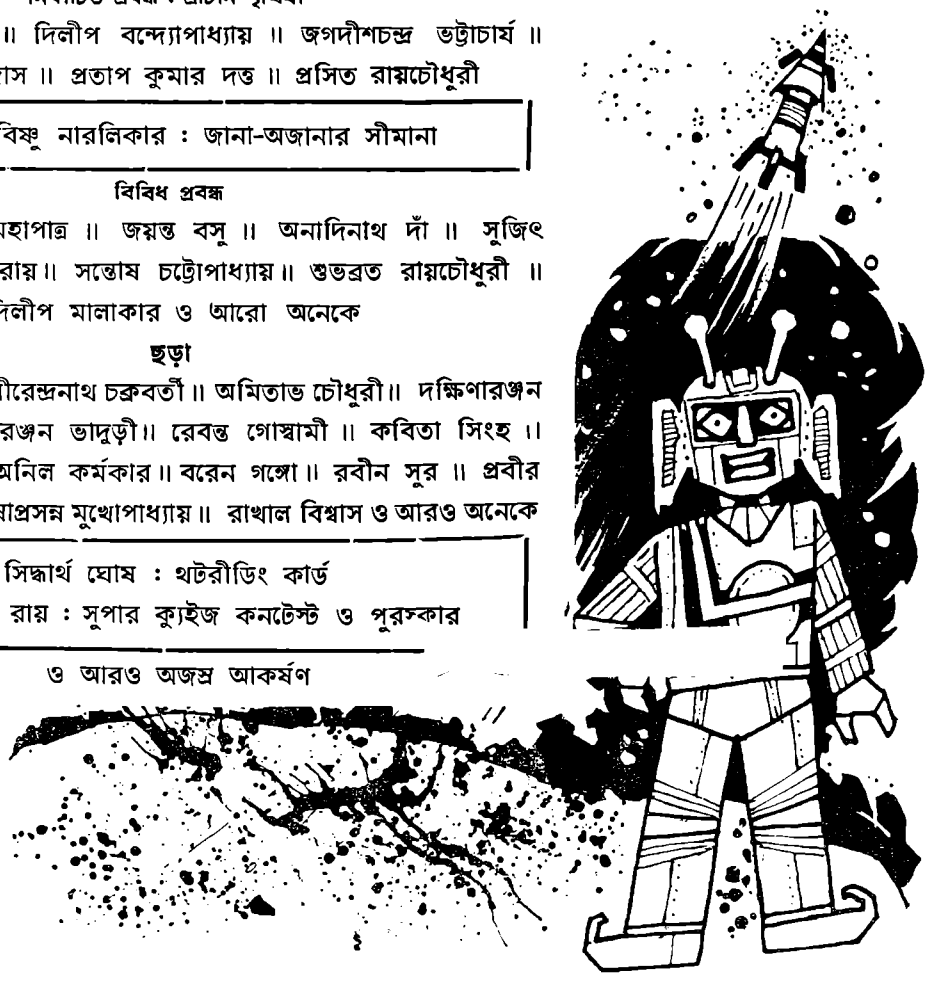

R/No 37390/81 KISHORE JNAN-BIJNAN 3rd year • Sept. 1983 Regd No WBCC/50

সচিত্র জ্ঞানবিজ্ঞান

অমরনাথ রায়
সংখ্যা নিয়ে খেলা ৮·00

সমরজিৎ কর
নোবেলজয়ী বিজ্ঞানী ১৫·00 সমুদ্রের সম্পদ ৮·00

অমরনাথ রায়
জ্ঞান-বিজ্ঞানের মজার খেলা ৫·00

অরূপরতন ভট্টাচার্য
রোবোট এল কেমন করে ৬·00

গোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য
বিজ্ঞানের আকস্মিক আবিষ্কার ৬·00

অমরনাথ রায়
সায়েন্স ক্যুইজ ১০·00

সিদ্ধার্থ ঘোষ
স্যাম লয়েড ও ল্যুইস ক্যারোলের ধাঁধা ১০·00
অঙ্কের ম্যাজিক খেলার লজিক ৬·00

বিজ্ঞান ও কল্পবিজ্ঞানের গল্প

লীলা মজুমদার
কল্পবিজ্ঞানের গল্প ১৫·00

ক্ষিতীন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য
লুপ্তধন ৮·00 মেঘনাদ ১০·00

অদ্রীশ বর্ধন
কিশোর সায়েন্স ফিকশ্যান ১৫·00

তুষারলোকের রহস্য ৮·00

শৈব্যা প্রকাশন বিভাগ • ৮/১এ শ্যামাচরণ দে ষ্ট, কলকাতা–৭০০০৭৩

কিশোর জ্ঞান-বিজ্ঞানের পক্ষে রবীন বল কর্তৃক ৮/১এ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলকাতা ৭৩ হইতে প্রকাশিত
এবং ৬ শিবু বিশ্বাস লেন, কলকাতা ৬, তাপসী প্রিন্টার্স হইতে মুদ্রিত। দাম দুই টাকা পঞ্চাশ পয়সা।
প্রচ্ছদমুদ্রণ রূপসা এন্টারপ্রাইজ, ২০০ বি বি গাঙ্গুলী স্ট্রীট, কলকাতা ১২